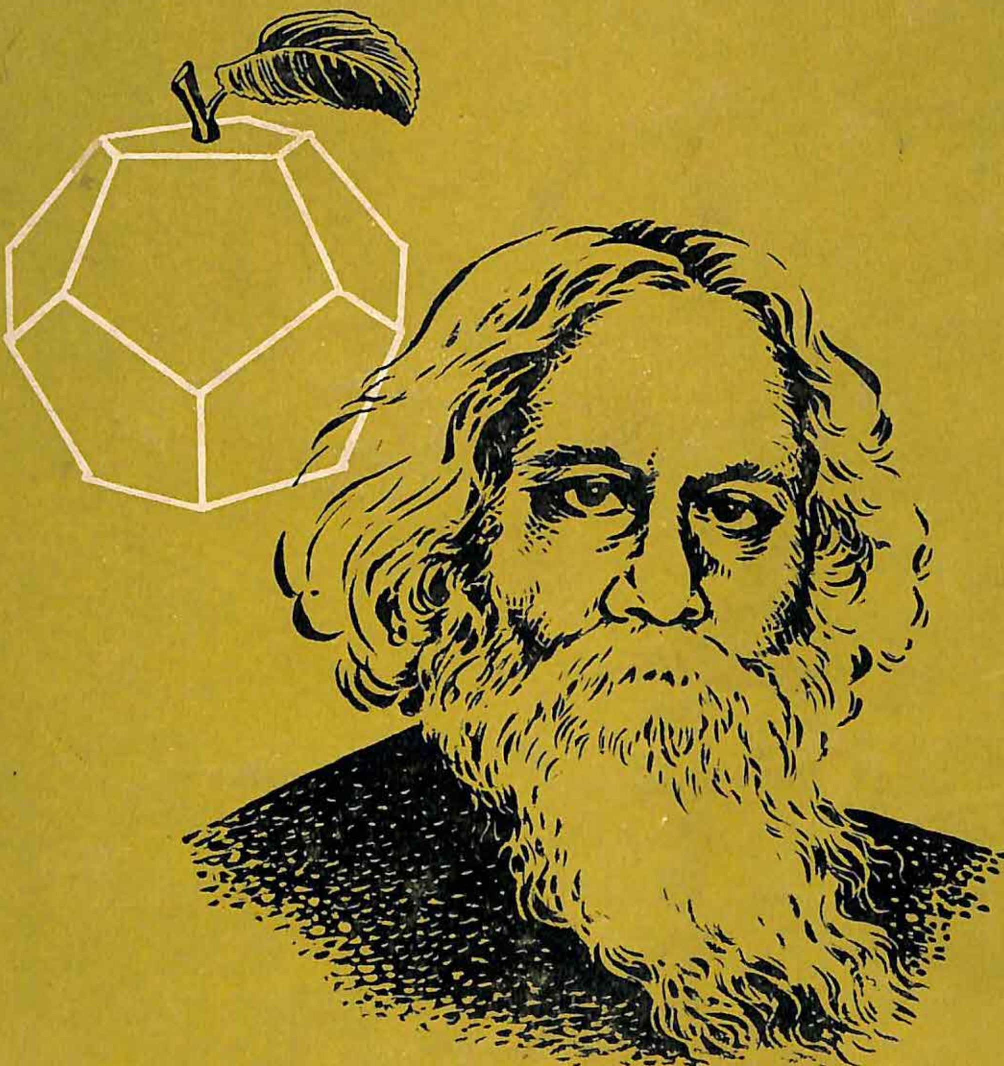
রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস



ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

श्री

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস

এক সময় জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, ‘তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।’

এ কথার সত্যতা প্রমাণের কোন সুযোগ পাওয়া যায়নি সত্য, কিন্তু তিনি যে আমৃত্যু বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী ছিলেন এবং বিজ্ঞান যে তাঁর মনীষাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহে প্রদীপ্ত করেছে তার উজ্জ্বল আভাস মেলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প ও নাটকের সুবিস্তীর্ণ এলাকায়।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-চিন্তার এই দিকটি সাধারণ পাঠকের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল, কিন্তু তরুণ বিজ্ঞানী ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার ডুবুরির মত রবীন্দ্রসাহিত্য-সমুদ্রের অতলান্ত প্রদেশে ডুব দিয়ে বিপুল পরিশ্রমে বিজ্ঞানের মণিমাণিক্যগুলিকে আহরণ করে এই গ্রন্থে সঞ্চয় করেছেন। যে কোন কৌতূহলী পাঠক এই গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তর্গত সামগ্রিক বিজ্ঞান-ভাবনার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

অমিয়কুমার মজুমদার এম. টেক., ডি. ফিল.,
ডি. এস সি (ইঞ্জিনীয়ারিং)., এম. বি. বি. এস.

'নব নব উন্মেষশালী বুদ্ধি'ই যদি প্রতিভা হয় তাহলে এই শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাটি যথার্থ সার্থক হয়েছে তরুণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী অমিয়কুমার মজুমদারের ক্ষেত্রে।

এক দিকে চিকিৎসাশাস্ত্র, অপরদিকে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং পাশাপাশি সাহিত্য-সাধনা এই বিভিন্নমুখী বৃত্তির আশ্চর্য সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছেন আপন প্রতিভা বলে।

বিদেশের আমন্ত্রণে ও সরকারী কর্মোপলক্ষে এই তরুণ বিজ্ঞানীকে একাধিকবার ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন গুণী জনসভায় আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্রে যোগদান করেছেন।

ডক্টর মজুমদারের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী। প্রবেশিকা থেকে প্রযুক্তি বিদ্যায় স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পর্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। তারপর বিদেশে গবেষকের জীবন শুরু। ডক্টরেট ডিগ্রিলাভের পর কর্মে ব্রত আছেন।

ভারতের, এমনকি বিদেশের বহু প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা তাঁর গবেষণা ও মননধর্মী মূল্যবান রচনার স্বাক্ষর বহন করছে।

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

কলকাতা-১২
১৩৭২

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
আশ্বিন, ১৩৭২ : সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

মুদ্রক : ফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনেটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : নরেন্দ্রনাথ দত্ত

দাম : ছয় টাকা

উৎসর্গ পত্র

মা'কে—

সশ্রদ্ধ প্রণতি সহ

ভূমিকা

অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, পি. এইচ. ডি , ডি. এস. সি. (এডিন), এফ. এন. আই., অধ্যক্ষ, পদার্থ-বিদ্যা বিভাগ, বসু বিজ্ঞান-মন্দির কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন 'ডীন'।

বোস ইনস্টিটিউট
৯৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

১লা আগষ্ট, ১৯৬৫

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা বিজ্ঞানকেও তার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল একথা সর্বজনবিদিত। বাল্যকাল থেকেই বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসার অন্ত ছিল না। তাঁর পূজনীয় পিতৃদেব পুত্র-কন্যাদের যে ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে ভাষাসাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, পদার্থ-বিদ্যা, গণিত, উদ্ভিদ, ও প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিষয়ও পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। শৈশবে মুখে-মুখে পিতৃদেবের কাছ থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা শুনে তিনি তাঁর তখনকার কাঁচা হাতে যে বড় প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেটিই তাঁর প্রথম ধারাবাহিক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার সূচনাতেই বিজ্ঞান যে গভীরতম প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ও বিজ্ঞান-চর্চা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। শান্তিনিকেতনে তিনি যে নিজের স্থাপিত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন, তার কারণ—শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়াথেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা 'অত্যাবশ্যক'—এই ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। তাঁর কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ে নানা মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছিলেন সাহিত্যে যার স্থান আছে। তাঁর শেষ বয়সের লেখা 'বিশ্ব-পরিচয়' বাংলা

বিজ্ঞান-সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। বলা বাহুল্য শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতূহল-তৃপ্তি নয়, সাহিত্যরস সৃষ্টিই 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্য প্রসঙ্গে তাঁর কবি-মানস ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও পুস্তক রচিত হয়েছে কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক মানস সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে কোনও কোনও প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হলেও রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বিজ্ঞান প্রীতি তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনায় কি গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ সুসংবদ্ধভাবে কোনও পুস্তকেই এ-যাবৎ আলোচিত হয় নি। তরুণ সাহিত্যসেবী ও কৃতবিদ্য বিজ্ঞানী ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস' গ্রন্থটি এ-অভাব পূরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বিজ্ঞানকে কি আসন দিয়েছিলেন, তাঁর কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে ও প্রবন্ধে নানাবিধ দৃষ্টান্ত, উপমা, যুক্তিতর্ক ও নায়ক-নায়িকার কথা-বার্তার মাধ্যমে, বিজ্ঞানের প্রভাব কি গভীর রেখাপাত করেছিল, রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিক্রমার পর্বে পর্বে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা কিভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, তরুণ গ্রন্থকার তাঁর সুলিখিত গ্রন্থখানিতে তার বিশদ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে দশটি অধ্যায়, যথা—

গ্রন্থকার রবীন্দ্র-জীবনের পরিসরকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্বে কবির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল বিক্ষিপ্ত—কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুসরণ করে তাঁর চিন্তা গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর কবি-প্রতিভা বিজ্ঞানের এই চিন্তাধারাকে এক বিশিষ্ট রূপ দিয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বে এই রূপায়ন ব্যাপকতর হয়েছিল, গতি-তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। শেষ পর্বে আধুনিক যুগের অভিব্যক্তিবাদ ও বিজ্ঞান-সম্মত জড়বাদ রবীন্দ্র-সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। গ্রন্থকার রবীন্দ্র-রচনা থেকে নানা উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁর এই মন্তব্য সমর্থন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনার এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ স্বীকার করে নিলেও একথা বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য সাধনায় তাঁর জীবন-দর্শনের যে মূলভাবটি তাঁর রচনাবলীর স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে পরিণতি লাভ করেছে, সে হল তাঁর বিশ্বানুভূতি। প্রতীকের সীমা ছাড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিক মানবতা ও বিশ্বজনীন চিরন্তন সত্যের সম্বোধ রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের প্রধান কথা। বিজ্ঞান এই সত্যের সম্বোধে সহায়তা করেছিল বলেই বিজ্ঞানকে তাঁর জীবনে তিনি বড় আসন দিয়েছিলেন। প্রকৃতিতে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচরে বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে তিনি 'বৃহৎ প্রাণে'র সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই বিজ্ঞানকে তিনি বরণ করেছিলেন। পার্থিব বস্তুর মাধ্যমেই অপার্থিব ঐশী সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়—একথা রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনকে একদিন বলেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানে যন্ত্র-শিল্প যখনই বিশ্বানুভূতিকে প্রতিহত করেছে—তখনই তার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রশিল্পের সুচিন্তিত সদ্ব্যবহারের কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন। 'কর্মজীবনে বিজ্ঞান' ও 'কবির দৃষ্টিতে যন্ত্র ও যন্ত্র-সভ্যতা'—এই দুই অধ্যায়ে গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গের সুন্দর আলোচনা করেছেন।

'কবি ও বিজ্ঞানী' অধ্যায়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এবং আমাদের দেশের গৌরব আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা সর্বসাধারণের কাছে বিশেষভাবেই উপভোগ্য।

গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত নন। তাঁর লিখিত অনেক প্রবন্ধ সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর সহজ ও সরল ভাষা এবং রচনাভঙ্গী

প্রশংসার যোগ্য। ভারতসরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি যে সাহিত্য-চর্চায় মন দিতে সক্ষম হয়েছেন—এ অতি আশা ও আনন্দের কথা।

১৯৫৮ সনে 'জনসেবক' পত্রিকায়, ১৯৬১ সনে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবং 'লোকসেবক' পত্রিকায় এবং পরে ১৯৬১ সনে নতুন আকারে 'সমকালীন' পত্রিকায় এই গ্রন্থের বিষয় বস্তু ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

১লা অগাষ্ট, ১৯৬৫
বসু বিজ্ঞান-মন্দির, কলকাতা

নিবেদন

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে এ জাতীয় গ্রন্থের সার্থকতা কি? রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি কবি-ই বটেন, বিজ্ঞানী তো নন। তা অনস্বীকার্য। অনেক বিজ্ঞানী কৌতুক ক'রে জিজ্ঞাসা করেছেন কলমের আঁচড়ে আমি রবীন্দ্রনাথকেও বিজ্ঞানী তৈরী করেছি কি না! বলা বাহুল্য কবিকে বিজ্ঞানী তৈরী করার কোন অপপ্রয়াস করি নি। তিনি যা নন, তাঁকে তাই বলে অসম্মানিত করবার দুষ্প্রবৃত্তি জাগে নি।

একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ প্রথাগতভাবে বিজ্ঞান পড়েন নি, গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন নি, কিন্তু তাঁর মেজাজ ছিল বিজ্ঞানীর। প্রায় মৃত্যু পর্যন্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখে চলেছেন। কৌতূহলী বৃত্তি, মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকা এবং পর্যবেক্ষণের মনোভাব বিজ্ঞানীর। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের নানা কাহিনী এবং রচনা থেকে অনুমান করা যায় বিজ্ঞানীর মনোভাব তাঁর ছিল। তা ছাড়া রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছে আরও ভালভাবে তাঁর বিজ্ঞান-প্রীতির কথা শুনেছি।

বিজ্ঞান যে তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে তার প্রমাণ তাঁর রচনা-সমূহ। সেখানে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বরাজি মণিমুক্তার মতো ছড়িয়ে আছে। এ কাজের জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ ও উপলব্ধির। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সরস্বতীর বরপুত্র হলেও বিজ্ঞানলক্ষ্মীর সাধনায় যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন। বিজ্ঞানের রাজ্যের নানা খবর সংগ্রহ করা এবং তাকে সাধারণের কাছে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশের জন্য তাঁর কঠোর প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার উদ্রেক করবেই। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায়, প্রবন্ধে তাঁর বিজ্ঞানপ্রীতি তীব্রভাবে প্রকটিত। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন আমৃত্যু। এ কথা অনস্বীকার্য যে তিনি যন্ত্রকে সুনজরে দেখেন নি—তবে ক্রমে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটেছে, তাঁর ধারণার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুধাবনযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা দিক

নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবনের এই বড়ো দিকটা অবহেলিত রয়ে গেছে। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ নিয়ে গবেষণা করবার জন্য উপদেশও দিয়েছেন। 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস' গ্রন্থে কবির জীবনের এই দিকটি উদ্ঘাটিত করতে যত্নবান হয়েছি।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমষ্টিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করেছি। তা সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই বিভিন্ন অংশে তাঁর রচনায় বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। একথা সত্য যে তিনি বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ করবার পরেই যে কবিতা রচনা করেছেন তা নয়। তাঁর স্বষ্ট অনেক কবিতা আলোচনা করলে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বাদির সঙ্গে মিল দেখা যায় এইটেই বলতে চেয়েছি।

গল্পকার বা ঔপন্যাসিক তাঁদের স্বষ্ট গল্পে বা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের নানা তত্ত্ব প্রকাশ করে থাকেন। সার্থক গল্পকার বা ঔপন্যাসিক হতে গেলে লেখককে মনস্তত্ত্ব জানতেই হবে। একারণে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে মনো-বিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাই এ বিজ্ঞানের অধিকারী নন; অথবা অতিপ্রাকৃত গল্পকে শেষ পর্যন্ত রিয়ালিটির আলোতে এনে ছেড়ে দেওয়া বা অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাসী হলেই তিনি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সমন্বিত হবেন এমন কোন কথা নেই। এধরনের মনোভাব বিরল দৃষ্ট নয়। তাই এ গ্রন্থে এ বিষয় দুটিতে আলোকপাত করবার প্রয়াস পাই নি। রবীন্দ্র-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সরসীলাল সরকার তাঁর গ্রন্থে সুন্দর আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।

বিজ্ঞান যে কবির অতি প্রিয় ছিল তার প্রমাণ হাস্যপরিহাসেও তিনি বিজ্ঞানকে আশ্রয় করেছেন। গ্রন্থের নানা স্থানে তার উল্লেখ আছে। ১২৮৮ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর একটি রচনা প্রকাশিত হয়। তা বৈজ্ঞানিক রসালাপ। বিষয়টি গণিতের। এখানে তা তুলে ধরবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। প্রবন্ধটি হলো এই :—

'এক একজন লোক আছে তাহারা যতক্ষণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে একটা শূন্য (০) মাত্র; কিন্তু একের সহিত যখনি যুক্ত হয় তখনি দশ (১০) হইয়া পড়ে। একটা আশ্রয় পাইলে তাহারা কি না করিতে পারে!

সংসারে শত সহস্র 'শূন্য' আছে, বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করিয়া থাকে —তাহার একমাত্র কারণ সংসারে আসিয়া তাহারা উপযুক্ত 'এক' পাইল না। কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার মধ্যেই হইল। এই সকল শূন্যদের এক মহা দোষ এই যে, পরে বসিলে ইহারা ১ কে ১০ করে বটে, কিন্তু আগে বসিলে দশমিকের নিয়ম অনুসারে ১ কে তাহার শতাংশে পরিণত করে ('০১) অর্থাৎ ইহারা অন্যের দ্বারা চালিত হইলেই চমৎকার কাজ করে বটে, কিন্তু অন্যকে চালনা করিলে সমস্ত মাটি করে। ইহারা এমন চমৎকার সৈন্য যে মন্দ সেনাপতিকেও জিতাইয়া দেয়। কিন্তু এমন খারাপ সেনাপতি যে ভাল সৈন্যদেরও হারাইয়া দেয়। স্ত্রী-মর্যাদা-অনভিজ্ঞ গোঁয়ারগণ বলেন যে স্ত্রীলোকেরা এই শূন্য। ১ এর সহিত যতক্ষণ তাহারা যুক্ত না হয় ততক্ষণ তাহারা শূন্য। কিন্তু ১ এর সহিত বিধিমতে যুক্ত হইলে সে ১ কে এমন বলীয়ান করিয়া তুলে যে, সে দশের কাজ করিতে পারে। কিন্তু এই শূন্যগণ যদি ১ এর পূর্বে চড়িয়া বসেন তবে এই ১ বেচারীকে তাহার শতাংশে পরিণত করেন। স্ত্রৈণ পুরুষের আর এক নাম '০১।' 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ' শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁর রচিত বিজ্ঞানের নিবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তবে কোন ক্ষেত্রেই কবির রচনা সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে পাঠককে বিব্রত করতে চাই নি।

তাই উদ্ধৃতি কম রেখে বিশ্লেষণের দিকে জোর দিয়েছি। কৌতূহলী পাঠক কবির বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি যাতে সহজেই পেতে পারেন তার জন্যে পরিশিষ্টে এক বিস্তৃত তালিকা দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইন প্রসঙ্গ বহুবার আলোচিত হয়েছে নানা লেখকের হাতে। একারণেই অসংখ্য চিঠিপত্র বা সমগ্র সংলাপ পুনরায় উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থকে ভারাক্রান্ত করবার অপপ্রয়াস থেকে নিজেকে বিরত রেখেছি।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানপ্রীতির মূলে কতিপয় বিজ্ঞানীর প্রভাবও অনস্বীকার্য। আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রভাব প্রবল। পরে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সার নীলরতন সরকার, বশী সেন, অধ্যাপক দেবেন্দ্র মোহন বসু প্রভৃতি বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁকে বিজ্ঞানের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছে তা ভাবাও অস্বাভাবিক নয়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রাজশেখর বসু, অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যও তাঁর

বিজ্ঞানপ্রীতিকে তীব্রতর করেছেন। আইনষ্টাইনের প্রভাবও কম নয়। এ গ্রন্থে এইসব দিকগুলি দেখাতে চেষ্টা করেছি।

বিশ্রুত অধ্যাপক ও মহা-বিজ্ঞানী শ্রদ্ধেয় ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ডি. এস. সি., এফ. এন. আই. (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিজ্ঞান বিভাগের ডীন এবং বর্তমানে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ) এই গ্রন্থখানি পাঠ করে ভূমিকা রচনা ক'রে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। তিনি আমার গুরুস্থানীয়। তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এবারে স্বকৃত কর্ম সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করবো। নিজের কথা নিজের মুখে বলা অশ্রদ্ধেয় তা মানি। তাহলেও তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য একথা সব লেখকেরাই অনুভব ক'রে থাকবেন। রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বেশ কিছু আগে ১৯৫৮ সালে এবং ১৯৫৯ সালে দৈনিক 'জনসেবক' পত্রিকার রবিবারের সাপ্তাহিকীর পৃষ্ঠাতে রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিজ্ঞান নিয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছিলুম। যতদূর জানি, এ জাতীয় প্রবন্ধ তখন আর রচিত হয় নি। পরে শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় এবং 'লোকসেবক' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এ বিষয়ে লিখি। লোকসেবক পত্রিকায় দীর্ঘ নয় সপ্তাহে কবির কাব্যে, প্রবন্ধে বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করি। এর পরবর্তী কালে কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার কয়েকটিতে (খুব সম্ভবতঃ তিনটি) রবীন্দ্রনাথের 'পরে বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। একটিতে শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী লেখেন।

১৯৬৩ সালে 'সমকালীন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের আগ্রহে 'রবীন্দ্র কাব্যে বিজ্ঞান' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করি। তাঁর উৎসাহে নতুন ভাবে চিন্তা করে ব্যাপক আকারে আলোচনা শুরু করি। 'রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান', 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান', 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মন', 'রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে যন্ত্রবাহন সভ্যতা', 'রবীন্দ্র-মানসে যন্ত্রের মূল্যায়ন' ইত্যাদি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করি। 'সপ্তর্ষি' পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে 'রবীন্দ্র দৃষ্টিতে যন্ত্র ও যন্ত্রবাহন বাণিজ্য' শীর্ষক আরো একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত

হয়। রবীন্দ্রনাথের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে চলেছি প্রায় ছ-সাত বছর ধরে। তারই ফলশ্রুতি 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস' গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি নতুন ভাবে বিশ্লেষিত।

'রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইন' প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য পেয়েছি অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর মহাশয়ের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ, শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয়ের 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও 'বিচিত্রা' পত্রে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীদিলীপ-কুমার নন্দী আমার সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে তুলেছেন। পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে নির্ভীক সমালোচনা করেছেন। তাঁর নিরন্তর প্রেরণা আমাকে উৎসাহিত করেছে। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কবি-বন্ধু শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বই লেখার সময়ে অনেক বাধা অপসারিত করেছেন আমার মা ও ছোড়দি। তাঁদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ নেই।

এ গ্রন্থের দুটি অধ্যায় কপি করেছেন আমার এক প্রাক্তন ছাত্রী। তিনি সুখী হোন এই কামনা করি। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার লাইব্রেরীর কর্মীরা, বিশেষতঃ শ্রীননী দাস আমাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সরবরাহ করে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কর্মীরাও নানা পত্র পত্রিকা সরবরাহ ক'রে সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি রূপা এণ্ড কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় ডি. মেহ্‌রাকে। এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর উৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৭২
৫৬এ, বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

অমিয়কুমার মজুমদার

সূচী

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

রবীন্দ্রনাথের যখন কৈশোর তখন উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ শেষ হবার মুখে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তখন বিনা প্রতিরোধে অগ্রসরমান। তার আগে কত ভাঙাগড়া, কত বিপর্যয়ের বাঁধ অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে হয়েছে বিজ্ঞানের রথকে। ধর্মের অনুশাসনে বিজ্ঞানের প্রদীপ নিভে এসেছিল প্রায়। ষোড়শ, সপ্তদশ শতক কুসংস্কারের তমিস্রাতে আচ্ছন্ন। মানুষের চেতনা তখন স্তিমিত। ধীরে ধীরে অপনোদিত হলো অজ্ঞানতার কুজ্ঝটি। এবার প্রদীপ নয়, সূর্য। তার আলোক উজ্জ্বলতর হতে লাগলো। তার জ্যোতিতে দিকচক্রবাল উদ্ভাসিত।

অষ্টাদশ শতকে যখন ইউরোপে বিজ্ঞানের আলোকধারা বইতে শুরু করেছে তখন আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা ছিলেন শাস্ত্র আলোচনায় রত ; নিমগ্ন থাকতেন জটিল দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে। ইয়োরোপের সেই বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস মানবজাতির ক্রমাগ্রসরতার ইতিবৃত্ত। তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র একক নয়, তা বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত সময়কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিবৃত্ত সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য সীমিত স্থানে সকল বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব। প্রধান প্রধান আবিষ্কারসমূহের কিয়দংশ বিবৃত করা হচ্ছে।

অষ্টাদশ শতক

পদার্থবিদ্যা ঃ সপ্তদশ শতকে চৌম্বকতত্ত্ব এবং তড়িৎ বিজ্ঞান নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয় নি। ফরাসী বিজ্ঞানী ডুফে এ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি দু-ধরনের তড়িতের কথা বললেন। গিলবার্ট তড়িত

সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করতে লাগলেন। 'লীডেন জার' আবিষ্কৃত হয়। এই শতকের উল্লেখযোগ্য নাম বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। তিনি তড়িতের ধর্ম সম্বন্ধে নতুন তত্ত্ব দিলেন। তিনি বললেন আকাশের বিজলীও তড়িৎ। গ্যালভানি এবং ভোল্টার নাম বিখ্যাত হয়েছে গ্যালভানিক ব্যাটারি, গ্যালভানিজম্, ভোলটেইক সেল প্রভৃতি বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় নানা বিষয়ের জন্য।

কাউন্ট রামফোর্ড প্রতিষ্ঠা করলেন যে তাপ একধরনের গতি। হামফ্রে ডেভি রামফোর্ডের বক্তব্যকে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ল্যাভয়সিয়র তাপ বিজ্ঞান নিয়ে কিছু গবেষণা করেন। হক্সবী প্রমাণ করলেন যে শব্দ কোন মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না। টমাস ইয়ং আলোকের তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে হিগেন এবং তাঁর 'wave theory of light'কে সত্য মনে করেন। অগাষ্টিন ফ্রেজনেল একই বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন। আলোকের বৈশিষ্ট্য দেখে তিনি বিচার করলেন যে আলোকতরঙ্গ জলতরঙ্গের মতো।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঃ এই শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কার অনেক অগ্রসর হয়েছে। হের্শেল (১৭৩৮-১৮২২) ছত্রিশ বছর বয়সে তাঁর নিজস্ব সাড়ে পাঁচ ফুট সাইজের টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। তিনি ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। তিনি ৮০৬টি যুগ্মতারা এবং ২৫০০ টি নীহারিকা বা নেবুলার সন্ধান পান। তিনি বললেন নক্ষত্র স্থির নয়, তারা পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়। নক্ষত্রের চলার গতি তিনি পরিমাপ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সূর্য ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি এবং তা স্থির নয়। মহাকর্ষ সৌরজগৎ অতিক্রম করেও কাজ করছে। এই সঙ্গে হের্শেল-ভগ্নী ক্যারোলিনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চার্য। হ্যালি ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করেন। লাপ্লাস (১৭৪৯-১৮২৯) নীহারিকাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

রসায়নবিদ্যা ঃ এ শতকে বহু পুরাতন তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেল। ফ্লজিষ্টন-তত্ত্ব ধূলিসাৎ হলো। এই তত্ত্বে বলা হতো—যে সব বস্তু পোড়ে তারা সকলেই এক বিশেষ পদার্থ দিয়ে তৈরী। তা হলো ফ্লজিষ্টন। বস্তুকে পোড়ান হলে অথবা কোন ধাতুকে উত্তপ্ত করা হলে তা পাউডারে পরিণত হয়, তাকে বলা হয় ক্যাল্‌ক্স (calx) এবং ফ্লজিষ্টন বাতাসে উড়ে যায়। তাহলে দেখা গেল সমস্ত বস্তুই যৌগিক। এ তত্ত্ব বাতিল হলো।

যোশেফ প্রিষ্টলে এবং কার্ল উইলহেলম পৃথকভাবে অক্সিজেন আবিষ্কার

করেন। ল্যাভয়সিয়র দহনক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিলেন। ক্যাভেণ্ডিস হাইড্রোজেন আবিষ্কার করলেন। অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের যৌগিক মিলন ঘটিয়ে জল তৈরী করা হলো।

ডেভি (১৭৭৮-১৮২৯) আয়োডিন আবিষ্কার করেন। রাসায়নিক সমীকরণ পদ্ধতির আবিষ্কার হলো এবং বস্তুর নিত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বায়োলজি ঃ প্রাণীসমূহের আবহাওয়াভেদে অবস্থানের এবং তাদের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা হলো। বিবর্তনের ধারণা জনপ্রিয় হতে থাকে। জেনার বসন্তের টীকা বের করেন।

অন্যান্য বিজ্ঞান ঃ জেমস্ ওয়াট (১৭৩৬-১৮১৯) স্টীম এঞ্জিন আবিষ্কার করেন। বিশুদ্ধ গণিতে ইউক্লিডের জ্যামিতির বাইরেও নতুন জ্যামিতি গড়া সম্ভব তা জানা গেল।

ভূতত্ত্ব ঃ হাটন তাঁর 'Theory of the Earth' গ্রন্থে ভূবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। ফসিল নিয়ে অনেক গবেষণা হয়।

উনবিংশ শতক

পদার্থবিদ্যা ঃ শক্তির বিভিন্ন রূপ নির্ধারিত হলো, শক্তির নিত্যতা-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। জানা গেল তাপ একধরণের শক্তি। প্রেস্কট জুল (১৮১৮-১৮৮৯) তড়িৎ প্রবাহের ফলে তাপ উদ্ভুত হবার কথা বললেন।

ওহম্ (১৭৮৯-১৮৫৪) দিলেন তড়িৎ বিজ্ঞানের এক সূত্র। বললেন $\text{রোধ} = \frac{\text{তড়িচ্চালক বল}}{\text{তড়িৎ}}$। স্থির তড়িৎ এবং প্রবহমান তড়িৎ উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান অসীম। বিকিরিত তাপের কথা শোনা গেল। আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, একস-রে, বেতার তরঙ্গের কথা জানা গেল। অ্যাম্পিয়ার বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের সম্ভাবনার কথা জানালেন। মাইকেল ফ্যারাডের তত্ত্ব অনুসরণ করে আবিষ্কৃত হলো ডায়নামো, ইলেকট্রিক মোটর।

ম্যাক্স প্লাঙ্ক দিলেন কোয়ান্টাম থিয়োরী তত্ত্ব। যন্ত্র বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার।

জোতির্বিদ্যা ঃ নেপচুন গ্রহ আবিষ্কৃত হলো। বর্ণালী বীক্ষণ উল্লেখযোগ্য গবেষণা। ফ্রনহোফার সূর্যালোকের বর্ণালী তুললেন, তিনি তার মধ্যে বহু কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখলেন। তাদের নাম দিলেন ফ্রনহোফার রেখা, এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। নক্ষত্রের গতি সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল।

রসায়নবিদ্যা ঃ ডালটনের পরমাণুবাদ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি প্রচার করলেন প্রতিটি পদার্থের শেষ অংশটি হচ্ছে পরমাণু। তাকে ভাঙা যায় না। পৃথক পৃথক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। প্রত্যেক পরমাণুর নিজস্ব ওজন আছে। ১৮১১ সালে অ্যাভোগাড্রো অণু পরমাণু পৃথকভাবে চিহ্নিত করে নতুন তত্ত্ব দিলেন। এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা অজৈব থেকে জৈব বস্তুর সৃষ্টি। শতকের শেষের দিকে ৮০টি মৌলের সন্ধান পাওয়া গেল। ১৮৫৬ সালে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তু থেকে রং প্রস্তুত করা হলো।

জৈববিজ্ঞান ঃ অষ্টাদশ শতকে লিউয়েনহুয়েক নিজের কাজের জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দণ্ডাকৃতি জীবাণুর অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন। এ যুগে পাস্তরের জীবাণু সম্পর্কিত গবেষণা উল্লেখযোগ্য। জার্মান শারীর-তত্ত্ববিদ শ্বান 'জারম থিয়োরী' প্রবর্তন করেন। পাস্তরের গবেষণা থেকে ব্যাকটিরিওলজির প্রতিষ্ঠা হলো। ডেভি, সিম্পসন চেতনা-বিলোপকারী ভেষজ আবিষ্কার করেন।

ভ্রূণবিদ্যা ঃ কার্ল এর্ণষ্ট ফন বের নামে এক জার্মান প্রাণীবিজ্ঞানী নিষিক্ত কোষ থেকে ভ্রূণবৃদ্ধির কৌশল জানান। কোষতত্ত্বের উন্নতি হলো। চার্লস লাইয়েল (১৭৯৭-১৮৭৫) তাঁর 'প্রিনসিপ্লস অব জিওলজি' গ্রন্থে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে বারংবার প্রাণীকুলের ধারাকে প্রতিহত করেছে এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করলেন। চার্লস ডারউইন (১৮০২-১৮৮২) বিবর্তনের তত্ত্ব দিলেন, গ্রেগর মেণ্ডেল (১৮২২-১৮৮৯) জীবতত্ত্ব নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন।

বিংশ শতক (রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত)

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে জে. জে. টমসন ইলেকট্রন নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। কুরী দম্পতী তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা

করেছেন রাদারফোর্ড আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় রশ্মির সন্ধান পেলেন।

রাদারফোর্ডের সঙ্গে অধ্যাপক সডি আরো কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তাঁরা দেখলেন তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি ধীর পদক্ষেপে বিরামহীনভাবে রূপান্তরিত হতে থাকে। ক্রমাগত ভাবে উঁচু পারমাণবিক ওজন থেকে নীচু মাত্রার ওজন বিশিষ্ট মৌল সৃষ্ট হয়। নবসৃষ্ট মৌলসমূহও অস্থায়ী। যখন তারা আর ভাঙে না তখন তাদের তেজস্ক্রিয়তাও থাকে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তিম দশা আসে সীসেতে পৌঁছে। ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিলেন। আলফা কণা পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত হানবার চেষ্টা করা হলো। প্রশ্ন উঠলো কি করে কেন্দ্রক সমস্ত বিপরীত কণাকেও আটকে রাখে। তার শক্তি কোথায়? উত্তর দিলেন আইনষ্টাইন। তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব বিজ্ঞানের জগতে যুগান্তর আনলো। ১৯৩৮ সালে ইউরেনিয়ম-২৩৫ আইসোটোপকে দ্রুত ধাবমান নিউট্রন দিয়ে আঘাত হেনে ফিসন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করা হলো। বিনির্গত হলো প্রচণ্ড শক্তি। আইনষ্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ শক্তি = ভর × (আলোকের গতি)^2 বিজ্ঞানীদের কাছে চাবিকাঠি। এ যুগের আরো উল্লেখযোগ্য নাম ফের্মি, ককক্রফ্‌ট, নীলস্‌বোর, লা মিট্‌নার, হাইসেন বার্গ। বিজ্ঞানের নানা শাখায় যে বিরাট অগ্রগতি সূচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার সম্বন্ধে প্রায় ভালভাবেই অবহিত ছিলেন।

বাংলা দেশে বিজ্ঞানের পটভূমি

রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই এদেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়ে গেছে। ইংরেজি শিক্ষা এদেশে প্রসার লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু অংশ বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠলেন। জনসাধারণকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান অবহিত করানোর একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টাও শুরু হলো। সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা হলো। অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'বৈজ্ঞানিক বিষয়' নিয়ে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। তা জনপ্রিয় হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাও কম নয়। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, কালী-প্রসন্ন ঘোষ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বিজ্ঞানী ছিলেন না, অথচ রবীন্দ্রনাথের মনে বিজ্ঞানপ্রীতি এনে দেবার মূলে তাঁর পিতা। মহর্ষিদেবের যথেষ্ট বিজ্ঞানপ্রীতি ছিল, সেকথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও তার পরিচয় মেলে: '১৮৯৩ সালে পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিবার সময় বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলার ছলে 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' সম্বন্ধে তিনি (মহর্ষি) ধারাবাহিকভাবে যে উপদেশগুলি দিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে তাঁহার মনের প্রসার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব…এ সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে তাঁহার কি অসাধারণ প্রবেশ ছিল! সমস্ত বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া বিধাতার সৃষ্টির অভিপ্রায়টি যে কেমন করিয়া ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিতেছে…' এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন বিজ্ঞানমুখী ছিল এবং নিঃসন্দেহে তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথে বর্তমান। এই সঙ্গে স্মরণ করতে হয় আরো দুজন মানুষের কথা যাঁরা নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিলেন বিজ্ঞান চর্চার দিকে—তাঁরা হলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও রাজশেখর বসু। রাজশেখর বসুর পাণ্ডিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। রাজশেখর বসু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় বিশেষ না লিখলেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টি ক'রে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন। শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি ল্যাবরেটরীও করেছিলেন রাজশেখর বসুর নাম জড়িয়ে।

কবির জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে অভ্যুদয় হ'লো এক নতুন যুগের। ইয়োরোপের নব্য বিজ্ঞান-চিন্তা বাংলা দেশেও অপরিহার্য হয়ে উঠলো। স্কুল বা কলেজে বিজ্ঞানের প্রবেশ সহজ না হলেও চিন্তাশীল মানুষের মনে বিজ্ঞান এক বিশেষ স্থান জুড়ে রইল। বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অবদানকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি, তার ফলে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষের মনোজগতে বিজ্ঞান তার স্বাক্ষর মুদ্রিত করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার জগতে যে বিপ্লব এনে দিয়েছিল, বাংলা দেশের তটপ্রান্তে উপনীত হলো সেই বিপ্লবের ঢেউ। তাকে হটিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল না। বাংলা দেশের চিন্তাশীলদের রাজ্যে এলো আলোড়ন। উনবিংশ শতকের এই বিশেষ আলোড়নের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর পাঠ্যতালিকায়, সেকালের নিয়ম মতো বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ যেমন ছিল, তেমনি স্বহস্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবারও স্বল্প সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। শৈশবের বিজ্ঞান-প্রীতি পরিণত বয়সে বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং জীবনের সায়াহ্নে তা তীব্রতম হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবন পরিধিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করলে দেখা যায়, প্রথম পর্বে কবির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল বিক্ষিপ্ত। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অনুসরণ ক'রে রচিত হয়েছিল জীবন-চিন্তা। যৌবনে লিখিত সোনার তরী প্রভৃতি গ্রন্থে বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব নিহিত ছিল তা পার-ডারুইন পর্বের বিশ্বতত্ত্ব। তাহলেও একথা অনস্বীকার্য যে কবির মানসিক আবেগের স্রোতে ঐ সব তথ্যও নতুন রূপে রূপান্বিত। মধ্যপর্বে রূপান্তরণ ব্যাপকতর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে কবিকে দেখা যায় দার্শনিকরূপে। জীবনের তত্ত্বকে এক নির্দিষ্ট ভাষ্যে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। সেখানেও তিনি বিজ্ঞানের কাছে কম ঋণী

নন। বলাকা থেকে যে যুগের শুরু হলো তার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠলো বিজ্ঞানের নতুন দিক—গতি-তত্ত্ব।

শেষ পর্বে তিনি আরও অভিনিবেশ সহকারে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা ও আলোচনা করেছেন। তার ফল সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হয়েছে তাঁর চিন্তায়, তাঁর রচনায়। অলীক কল্পনার জগৎ থেকে তিনি সরে এসেছেন, পা দিয়েছেন মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌-এর রাজ্যে। দেখেছেন বিজ্ঞান বুদ্ধিকে, পরখ করেছেন তাকে তার নিজস্ব এক্তিয়ারের মধ্যে। ১৯২৭ সালে রচিত 'নটরাজের' মধ্যে পাই আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত জড়বাদ ও সৃষ্টিবাদের আভাস। 'বিশ্ব পরিচয়' রচনার মধ্যে কবির বিজ্ঞানপ্রীতি প্রকাশ পেল পরিপূর্ণভাবে।

রবীন্দ্রনাথের বড়ো পরিচয় তিনি কবি। প্রচলিত আছে, কবিরা সাধারণতঃ কল্পনার জগতে বাস করেন। স্থূল জগতের বিজ্ঞান তাঁদের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে না বলে অনেকের ধারণা। সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা বিরোধ বর্তমান এ কথাও অনেকে প্রকাশ ক'রে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কোন সংঘাতের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়, কারণ ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান। তবে যদি কথাটাকে সংকুচিত বা সংকীর্ণ অর্থে অভিহিত করতে চাই, তাহলে বলা উচিত পর্যবেক্ষণ-লব্ধ বিশেষ জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান। যে সব কবির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা আছে তাঁদের রচনায় পরিলক্ষিত হয় এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন কবি সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র সুর অনুরণিত হয় তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যে যে অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় তার মূলে তাঁর ঐ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। কাব্যরসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাঁকে প্লাবিত করতে পারে নি তার কারণও তাঁর বৈজ্ঞানিক মেজাজ। কবি-মনের উচ্ছ্বাসের প্রান্তে এসে বাধা সৃষ্টি করেছে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন। সুস্থ, স্বাভাবিক পথে চালনা ক'রে এক রসোত্তীর্ণ জগতে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে তাঁর বিজ্ঞান-রসিক সত্তা।

এক শ্রেণীর সাহিত্যিক এবং কবি আছেন যাঁরা সাহিত্যের এলাকায় বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র প্রভাব উষ্মাসহকারে দেখেন। এমন কি অনেক

সাহিত্যের ছাত্র আছেন যাঁরা বিজ্ঞান জানেন না, একথা বলে উল্লসিত হন। অথচ বিরল প্রতিভার কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বিজ্ঞানের যে প্রভাব অনুভব করেছিলেন তা আকস্মিকভাবে ঘটে নি, শৈশব থেকে জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত বিজ্ঞানের নানা মহলে তাঁর মন আনাগোনা করেছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় থেকে তিনি আহরণ করেছেন মন তৈরী করবার নানা উপাদান। একথা সত্য যে উপনিষদের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে তিনি বড়ো হয়েছেন, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, মহর্ষি থেকে শুরু করে গৃহশিক্ষক পর্যন্ত সকলেই কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক রসের সন্ধান কবিকে দিয়েছিলেন তাঁর বাল্যকালেই। মনে হয় শৈশবে তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে যে অনুশীলন করেছিলেন তারই ফলশ্রুতিরূপে তিনি অধিকারী হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক মেজাজের।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে স্কুল আরম্ভ হলো। 'দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাস পিণ্ডের মত প্রবেশ করিতে লাগিল।' নর্মাল স্কুলে তাঁদের যা পড়তে হতো, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়তে হ'তো বাড়িতে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর 'যাঁতাকল' চলতে থাকতো। কল চালাবার ভার ছিল কবির সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। ভোরের অন্ধকার থাকতে উঠে লেংটি পরে প্রথমেই হীরা সিং নামে এক কানা শিখ পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করতে হতো। তারপরে জামা গায়ে চড়িয়েই পড়তে বসা। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল তাঁদের পড়াতেন। পড়তে হতো অক্ষয় দত্তের 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থ-বিদ্যা', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তু বিচার' ও সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণবৃত্তান্ত', মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য।' এ ছাড়া জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল পড়তে হয়েছে। স্কুল থেকে ফিরে এলে ড্রইং ও জিমনাষ্টিকের শিক্ষক আসতেন। সন্ধ্যার পর ইংরেজী পড়াবার জন্যে আসতেন অঘোরবাবু।

সকাল থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত কঠিন শারীরিক ও মানসিক ব্যায়ামের মধ্যে তাঁদের নর্মাল স্কুলের যুগ কাটে। রবিবার সকালে সীতানাথ দত্ত

(সীতানাথ ঘোষ ? ঃ রবীন্দ্রনাথ খুব সম্ভবতঃ নাম ভুল করেছিলেন) এসে যন্ত্রযোগে প্রকৃতি বিজ্ঞান শেখাতেন। এইটে রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগতো। তিনি লিখেছেন, 'জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাত্‌লা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারি জল নীচে নামিতে থাকে এবং এই জন্যই জল টগ্‌বগ্‌ করে—ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্পের আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়, একথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।'

এছাড়া ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের একজন ছাত্র বালকদের (রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গী পড়ুয়াদের) অস্থিবিদ্যা শেখাতেন। অঘোরবাবু নামে যে শিক্ষক সন্ধ্যার পর বালকদের ইংরেজি পড়াতেন, তিনি ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। শিক্ষাকে সরস ও আনন্দদায়ক করে তোলবার জন্যে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অপরিসীম। তাঁর কাছে বালকেরা একদিন মরা মানুষের কণ্ঠনালীর সাহায্যে স্বরযন্ত্রের কলাকৌশল অবগত হন। এতে বালক রবীন্দ্রনাথের মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল। আর একদিন শিক্ষক মহাশয় তাঁদের মেডিক্যাল কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে মেঝের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল। মেঝের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়েছিল। 'সেই মেজের-উপর-পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারে নাই।'

কবির ছেলেবেলাতেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ছেলেবেলাকার এইসব বিদ্যায়োজনকে রবীন্দ্রনাথ অকিঞ্চিৎকর বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। কিন্তু মনে হয়, বিজ্ঞানের প্রতি কবির আজীবন অনুরাগের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে ছেলেবেলাকার এই সামান্য শিক্ষার ভিতর দিয়ে। ফুলের পাঁপড়ি থেকে রস বের করে লেখার ঝোঁক চেপেছিল তাঁর। তাঁরই দেওয়া ডিজাইনে কাঠের যন্ত্রও তৈরী করা হয়, বলা বাহুল্য তাতে ফল দর্শায় নি। কবি

বলেছেন, জীবনে এই প্রথম এঞ্জিনীয়ারি করতে নেমেছিলেন, এবং সেখানেই শেষ। কিন্তু পরীক্ষণ বৃত্তি থেমে যায় নি, বরং আজীবন তাকে লালন করে গেছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'বাল্যকালে আমের আঁটি ও আতা-বীচির পরীক্ষার কথা লইয়া তিনি (কবি) নিজেকে ঠাট্টা করিয়াছেন, কিন্তু পরযুগে কৃষি লইয়া তিনি যে কতরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা কেহ এখনো করেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে আমের চারাকে লতানে গাছ করিবার জন্য তাঁহার যে উদ্যম দেখিয়াছি, তাহা কেবল বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব।' —(রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড)

এ ছাড়া ঠাকুরবাড়ীর সকলেই কমবেশী বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থশালায় জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিজ্ঞানের বই ছিল। পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্রটির মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের বীজ রোপন করেছিলেন। ড্যালহৌসি পাহাড়ে থাকাকালীন মহর্ষি সন্ধ্যাবেলায় বালক রবীন্দ্রনাথকে গ্রহ-নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, তাছাড়া কক্ষচক্রের দূরত্ব মাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় ইত্যাদির কথা শুনিয়ে যেতেন। 'তিনি (মহর্ষি) প্রক্টরের (Richard A. Proctor) লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।' এ সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'তিনি যা বলে যেতেন, তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম। জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।' জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা সকলের কাছে জানানো বেশ কৌতুকের বিষয় ছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়েও যে আলোচনা করতে পারেন তা প্রচার করা বোধহয় তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জীবনস্মৃতিতে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'সম্প্রতি (ড্যালহৌসি থেকে ফেরার পর) প্রক্টরের গ্রন্থ হইতে গ্রহ-তারা সম্বন্ধে অল্প যে একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহাও সেই দক্ষিণবায়ুবীজিত সান্ধ্যসমিতির মধ্যে বিবৃত করিতে লাগিলাম।' দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই প্রাণী ও

জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। হেমেন্দ্রনাথও খুব উৎসাহী বিজ্ঞান লেখক ছিলেন। এঁদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়া স্বাভাবিক। বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছেন পড়েছেন। কবি বলেছেন, 'মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্রতার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না এ কথাও বলা চলে না।'

নিজের বিজ্ঞান পাঠ সম্বন্ধে বলেছেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয় নি। স্যার রবর্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্ব্‌স্‌, ফ্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি, গলাধঃকরণ করেছি শাঁসসুদ্ধ বীজসুদ্ধ। তার পরে এক সময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধ-মালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায়, কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিবেন।' —(বিশ্বপরিচয় ঃ ভূমিকা)

কবিতার কল্পলোক থেকে কবি বারেবারে নেমে এসেছেন জড়জগতের মাঝে। আর যে বিজ্ঞানকে কবি-সাহিত্যিকেরা উপেক্ষা করে এসেছেন, কবি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন তাকে। তারই সার্থক ফলশ্রুতি দীর্ঘজীবন ব্যাপী অজস্র কবিতাগুচ্ছের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপুল বিন্যাস।

কাব্যরচনার প্রদোষকাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা আমরা জানি। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূবিদ্যা নিয়ে ছোটদের উপযোগী সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা

হতো ছেলেদের উপযুক্ত করে বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লেখার ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের উপরে। প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সরস ও সরলভাবে লিখতেন। কবির সরস ভাষার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্য মিলিত হয়ে রসগ্রাহী কাহিনীর সৃষ্টি হতো। একটি থেকে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—'আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশে ছদ্মবেশ ধারণ কীট-পতঙ্গের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি অনেকে জানেন। তাহা ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির স্বাভাবিক আকার-সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাদ্য-সংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে। একটা নীল প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। পুষ্পস্তবকের মধ্যে একটি ঈষৎ শুষ্কপ্রায় ফুল দেখা যাইতেছিল। প্রজাপতি যেমন তাহাতে শুঁড় লাগাইয়াছে অমনি তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে ফুল নহে সে একটি সাদা মাকড়সা। কিন্তু এমন এক রকম করিয়া থাকে যাহাতে তাহাকে সহসা ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।'

১২৯৮ সালের (বঙ্গাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাধনার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ জীববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে লেখা। 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ সংগ্রহ' শিরোনামায় বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ লিখতেন। জীববিজ্ঞান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির মূল্য যথেষ্ট। ১২৯৮ সালের 'পৌষ' সংখ্যার 'সাধনা'তে রবীন্দ্রনাথের রচিত 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য' শারীরবিদ্যাবিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। ঐ সংখ্যাতেই 'গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়' নিবন্ধটি প্রথমশ্রেণীর বিজ্ঞান সাহিত্যে পরিণত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সামান্য উদ্ধৃতি তুলে ধরছি—

'আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চোঙের মত আছে তাহার বিশেষ কার্য কি এপর্যন্ত ভালরূপ স্থির হয় নাই। পূর্বে শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শব্দের দিক নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি দুই একজন পণ্ডিত ইহার অন্যরূপ কার্য স্থির করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, আমরা কি করিয়া গতি অনুভব করি এ পর্যন্ত তাহার কোন ইন্দ্রিয়তত্ত্ব জানা যায় নাই। একটা গাড়ি যদি কোনরূপ ঝাঁকানি না

দিয়া সমভাবে সরলপথে চলিয়া যায় তাহা হইলে গাড়ি যে চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না—পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু গাড়ি যদি ডাহিনে কিম্বা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় তবে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে কর্ণেন্দ্রিয়ের উক্ত অংশই এই গতিপরিবর্তন অনুভব করিবার উপায়। একপ্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাৎ হইয়া পড়ে এবং কানে শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই অর্ধচক্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বিকৃতিই তাহাদের রোগের কারণ। কোন্ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিলে কাজেই তাহাদের পক্ষে শক্ত হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চনীচতা মাপিবার জন্য কাচের নলের মধ্যে তরল পদার্থ দিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্মিত হয়। আমাদের গতি পরিবর্তন অনুসারে আমাদের স্নায়ুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং আমরাও তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই।' —(সাধনা, ১২৯৮)

জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও রবীন্দ্রনাথ দু-একটা প্রবন্ধ লিখেছেন এই পত্রিকাতে। জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বরাবরই সজীব ছিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে পদার্থবিজ্ঞান অপেক্ষা জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁর চিত্তে বেশী সাড়া জাগিয়েছে তা সামান্য অনুধাবন করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ছিন্নপত্রের কয়েকখানি পত্রে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। একথা সত্য 'বালক', 'সাধনা'কে কেন্দ্র করেই তাঁর অধিকাংশ বিজ্ঞান আলোচনা নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু এগুলিই একমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা (১৯১০—১৯১৫) প্রকাশিত হবার সময়ে অপেক্ষাকৃত নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকদের বেশ কয়েকটি মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্বে জীবন সম্পর্কে যে নতুন ভাষ্য রচনা করতে সাহায্য করেছে জীববিজ্ঞান, ক্রমবিবর্তনবাদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, তা আগেই বলা হয়েছে। নিউটন, ডারুইনের আবিষ্কৃত তথ্য এবং বেকন ও কান্টের তত্ত্বচিন্তা উনবিংশ শতকের বাংলাদেশকে প্লাবিত করে ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম অধ্যায়ে এই তত্ত্বচিন্তার প্রভাব যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে

তা যথাসময়ে আলোচনা করা হবে। এমন কি ডারুইনের জীবন সংগ্রাম তত্ত্বটিও প্রকাশ পেয়েছে বিসর্জন নাটকে রঘুপতির সংলাপে এবং গান্ধারীর-আবেদন কবিতায় দুর্যোধন ও গান্ধারীর বিপরীতমুখী বক্তব্যের মধ্যে।

প্রথম পর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কারণ হয়তো এই যে এই বিশেষ দুই শাখার মধ্যে কবির বিশিষ্ট মানস-প্রকৃতি সমৃদ্ধতর ও পরিপুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছিল। কবির ভূমাবোধ, প্রকৃতিপ্রেম, বিশ্বৈক্যানুভূতি বিজ্ঞানের এই দুই-বিভাগ-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলির মধ্যে অনুকূল আশ্রয় পেয়েছিল। প্রথম জীবনে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাহচর্যে তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল একথা বললে অসত্য বলা হবে না। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রাঞ্জলভাবে বাংলাভাষায় প্রকাশ করে কবি জগদীশচন্দ্রের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। পরবর্তী যুগে প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, বশীসেন প্রমুখের সংস্পর্শে এসে নব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশদভাবে অবহিত হন। তৎকালীন রচনায় সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জার্মানীতে গিয়ে আইনস্টাইন এবং আরো কয়েকজন বিজ্ঞানী-মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কৌতূহল আরো বাড়ে। জার্মানীতে গিয়ে আইনস্টাইনের কাছে তৎকালীন তরুণ খ্যাতিমান বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা অবহিত হন। এদেশে ফিরে আচার্য বসুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। সে সময় অধ্যাপক বসু বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে প্রথম সারিতে উপনীত হয়েছেন।

দীর্ঘদিন পূর্বে শিলাইদহের জীবনে তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক লরেন্সকে গুটিপোকা চাষে উৎসাহ প্রদান করা থেকে শুরু করে শ্রীনিকেতন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিটি স্থানে বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। পরিণত বয়সে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ রচনা করে তা উৎসর্গ করেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে। ভূমিকায় তিনি জাতীয় জীবনে কাজকর্মের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপযোগিতা সম্বন্ধে বলেছেন—

'বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে

অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।' বলাকা পর্বে যে গতিতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে তা মুখ্যতঃ দর্শনের উপর ভিত্তি করে, তা গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে। বের্গসঁ-এর মতো রবীন্দ্রনাথও গতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বকে নিয়েছেন তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের অনুকূল করে। অভিব্যক্তি সর্বস্তরেই বর্তমান। মানুষের বিবর্তন যেমন বহিরঙ্গেও তেমনি সংস্কৃতিগতও। কেবলমাত্র দেহের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেই হবে না, মানসিক সামাজিক দিকের প্রতিও মনোনিবেশ করতে হবে। জুলিয়ান-হাক্সলী এবং বর্তমান বিজ্ঞানীরা এই কথা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে এ সত্যটিকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। একস্থানে তিনি বলেছেন, 'অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানতঃ প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়।...যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা।'

'বৌঠাকুরাণীর হাট' লেখার সময়েই কবি বিজ্ঞানের অনেক বই পড়ে ছিলেন। এ সম্বন্ধে কবির জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সদর স্ট্রীটের বাসায় থাকাকালীন তিনি হাক্সলী, নিউকোম্বস্, লকইয়ার প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বিজ্ঞানের বই পড়া—বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যা বা Astronomy পড়ায় তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) যে কী আনন্দ ছিল। রবার্ট বল্-এর বইগুলি পড়েছিলেন—আমাদেরও পড়তে উৎসাহিত করেন। শেষ জীবনে 'বিশ্ব পরিচয়' লিখতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়াও আধুনিক পদার্থ বিদ্যার বই পড়তে হয়; যেখানে বুঝতে পারতেন না—প্রমথ সেন প্রভৃতিকে ধরে বুঝে নিতেন। অ্যাস্ট্রনমী ছাড়া জীবতত্ত্বের বইও পড়তেন—তার প্রমাণও প্রচুর। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্য তাঁকে বেশ পড়াশুনা করতে হয়—তবেই না

বঙ্গদর্শনে সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে পেরেছিলেন ; জগদীশচন্দ্র কবির প্রবন্ধ পড়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন ।'[১]

ইংরেজীতে যা পড়েন, বাংলায় তা লিখতে চান—কিন্তু পরিভাষার অভাবে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার ক'রে বলতে পদে পদে বাধা পান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা ও আলোচনা হয়। দুজনেই দেখেন যে, কোন একজনকে দিয়ে বিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, আর তা সম্ভব হলেও সবাই মেনে নেবেন কেন। অতএব কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সব কাজ সংকলিত ও সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। তখন বাংলাদেশে এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাঁরা এক সংস্থা গঠন করার প্রস্তাব করেন। নাম দেওয়া হয় 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন'। সভাপতি হন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

কবির এ আশা তখন পূর্ণ হয় নি, একথা বলাই বাহুল্য। ১৩০৫ সালে কবি 'প্রসঙ্গ কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের দেশের বিজ্ঞান চর্চার প্রণালী নিয়ে আলোচনা ও অভিমত প্রকাশ করেন। তখন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানকার গবেষণার কাজ সম্পন্ন হতো ইংরেজীর মাধ্যমে। এতে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা প্রসারলাভ করতো না। বিজ্ঞানচর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশের সকলকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকিত জগতে নিয়ে আসা। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর করবার কাজেই লিপ্ত ছিলেন। উল্লিখিত প্রবন্ধে কবি বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন, 'বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসা-বৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণ শক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যথাযাথ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ের মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।…বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে যথানিয়মে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।'

---

১ পড়ুয়া কবি—গ্রন্থজগৎ ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ৬

রবীন্দ্রনাথ কবি, বিজ্ঞানী নন। এ কথা বলার কারণ এই যে বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে নিরীক্ষণের সমুদ্র অতিক্রম করে প্রকৃতির অনাবিষ্কৃত কোন রহস্যকে উন্মোচিত করেন অথবা কোন নূতনতর সিদ্ধান্তে উপনীত হন—কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে তদ্রূপ কোন ঘটনার সম্ভাবনা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অথচ আশ্চর্যের এই যে উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানবিমুখ বঙ্গভূমিতে লালিত হয়েও এবং কাব্য-সরস্বতীর আরাধনায় সাধনভূমিতে একনিষ্ঠ সাধকের গৌরব অর্জন করেও তাঁর অন্তরে বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভূত হতো।

একথা চিন্তা করলে অবশ্যই বিস্ময়ের উদ্রেক হয় যে যথার্থ বিজ্ঞানীদের অনেকে জীবনের ক্রমাগ্রসরতার পথে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে অলৌকিক তত্ত্বকে মিশিয়ে ফেলেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই অতি অলৌকিকতাকে পশ্চাতে রেখে যথার্থ বিজ্ঞান-দৃষ্টির অভিমুখে অগ্রসর হয়েছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের বক্তব্যকে তিনি নিজের অনুভূতি দিয়ে বিচার করেছেন, রূপের পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানীর মতো পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সংমিশ্রণ ঘটান নি। এ কারণেই হয়তো তাঁর রচিত 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থটি স্বধর্মচ্যুত হয় নি। কবি বা দার্শনিকের কোন তত্ত্ব এতে স্থান পায় নি। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর একটি নিজস্ব দর্শন গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, নানা অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে। কাণ্ট, বের্গসঁর সঙ্গে উপনিষদের পরম তত্ত্ব তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর সমগ্র রচনাবলীর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে যে কোনদিনই তিনি বিজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেন নি। জীবন-সায়াহ্নে জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস আগেকার মত দৃঢ় ছিল কিনা তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকতে পারে, তবে মানুষের আত্মশক্তির উপর, বিজ্ঞান শক্তির উপর যে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছিল, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

কবির বিজ্ঞানপ্রীতি নিয়ে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর এক গ্রন্থে[২] লিখেছেন, 'তাঁর (কবির) সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার ১৯২৪ সালে।

২ রবীন্দ্রনাথ—অন্নদাশঙ্কর রায়

সে সময় লক্ষ্য করি তিনি আহারের পর বিশ্রাম করছেন হেলান দিয়ে। হাতে একখানা 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান'। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর রুচি ছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটি আমার গৃহিণীর মুখে শোনা। কবির মহাপ্রয়াণের বছর খানেক আগে আমরা শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসি। কয়েক মাস থাকি। বিশ্বভারতীর একটি ছাত্র আমাদের কাছ থেকে হগ্‌বেনের বিখ্যাত বই 'ম্যাথেমেটিকস্ ফর দি মিলিয়ন' পড়তে নেয়। পরে তাই দেখে অঙ্ক কষে অধ্যাপককে অবাক ক'রে দেয়। প্রণালীটা কোথায় পেলে, জানতে চান অধ্যাপক। তখন সে বইখানা তাঁকে দেখায়। বই আর আমাদের বাড়ীতে ঘুরে আসে না। খোঁজ, খোঁজ। আমার গৃহিণী অবশেষে শুনতে পান বই চলে গেছে গুরুদেবের হাতে। তিনি তন্ময় হয়ে পড়ছেন। একেই বলে 'গৃহীত এব কেশেষু'। মৃত্যু যখন তাঁর কেশ স্পর্শ করেছে তখনো তিনি নিবিষ্টচিত্তে অঙ্কশাস্ত্র পড়ে নিচ্ছেন। শুধালে উত্তর দেন, যাবার আগে ভরিয়ে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে কেবল যে আপনাকে ভরিয়ে নিয়েছিলেন তাই নয়, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেল বন্ধন করতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে অনুমান করলে অযথা হবে না।' শেষের লাইনটির যথার্থ ব্যাখ্যা 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ আলোচনার কালে পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে জীবনের শেষ পর্বে কবি বিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আইনস্টাইন, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রভাবও তাঁর উপরে কম নয়। ইতিমধ্যে প্রাণবিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের রাজ্যে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে পুরোনো তথ্য ও যুক্তি ভেঙে গিয়ে বিপ্লবের সৃষ্টি হলো। ইলেকট্রন-প্রোটন-কোয়ান্টা, তেজস্ক্রিয়তা, আপেক্ষিকতত্ত্ব, কোয়ান্টামবাদ, ফিউসন, ফিসন ইত্যাদি নানা আবিষ্কারের ফলে পদার্থ-বিজ্ঞানের ধারা গেল পালটে। এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বিবর্তন প্রজনন তত্ত্বের নব নব আবিষ্কারের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণ বিজ্ঞানের এলাকায়। এই বিপুল অগ্রসৃতি সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এই জানার ফলশ্রুতি ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। বিশ্বপরিচয় বাদ দিলেও, খাপছাড়া, প্রহাসিনী, সেঁজুতি, নবজাতক প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিজ্ঞানের নব নব তথ্যগুলি ছড়িয়ে আছে রত্ন কণিকার মতো।

একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞানের কয়েকটি আবিষ্কারের উল্লেখ থাকলেই বৈজ্ঞানিকতা হয় না। বিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি হলে ব্যক্তিমানসের পটে গড়ে ওঠে একটি সামগ্রিক বক্তব্য বিশ্ব সম্পর্কে। মনে হয় এই বক্তব্যকে যথাযথভাবে অনুসরণ করাই হচ্ছে বিজ্ঞান বুদ্ধি। বিজ্ঞানের মধ্যে আছে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার রীতি। কাব্যজগতেও তা থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ও কাব্যে এই বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া মূর্ত হয়ে উঠেছে। একারণেই তাঁর দৃষ্টি সহজ ও বাস্তবানুগ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করলে সহজেই টের পাওয়া যাবে প্রখর বাস্তব চেতনার স্ফুলিঙ্গ। পরম আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছেও তিনি তাঁর যৌবনের অধ্যাত্মজগতে পশ্চাদপসরণ করেন নি। প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে তিনি বিস্ময়কর বিজ্ঞান-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞান ব্রতী হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের রাজত্বে প্রাণীজগতের অভিব্যক্তির বা ক্রমবিবর্তনের সুস্পষ্ট ধারা আবিষ্কার করবার মহতী প্রচেষ্টায়। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য প্রভাবিত করে দার্শনিককে, আলোড়ন সৃষ্টি করে কবি-চিত্তাকাশে। তার ফলে তাঁরা জীবনের নতুন অর্থ আবিষ্কার করেন। তাঁদের ধারণা যতটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাছাকাছি, ততোটাই তা বাস্তব। তবে কবি সাহিত্যিক দার্শনিকের কাছে তত্ত্বের যে কিছু রূপান্তরণ ঘটবে তা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার তফাৎ হয় নি। কবির জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও দর্শনের এক আশ্চর্য সমন্বয়ে। এ সমন্বয় ঘটেছে কবির নিজস্ব অনুভূতির আলোতে। বৈজ্ঞানিক দর্শনকে তিনি স্বীয় ভঙ্গীতে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতি, গাছ, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে যে বিবর্তনের ধারা নিত্যবর্তমান, কবি তাকে মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, এমন কি মনোজগতেও অভিব্যক্তিবাদের ধারা অনুভব করেছেন। জন্ম-মৃত্যু-পারিপার্শ্বিক অবস্থা-বাধা-সংগ্রাম ইত্যাদি ক্রমবিবর্তনের বিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্ব কবি জানতেন। তা তিনি প্রয়োগ করেছেন জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী নন, অপবিজ্ঞানীও নন, তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সমন্বিত কবি।

পৃথিবী যেমন সূর্য থেকে সংগ্রহ করেছে নানা উপাদান, তেমনি রবীন্দ্রনাথও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূর্যকিরণ থেকে গ্রহণ করেছেন বহু জিনিস।

তাঁর রচনা পাঠ করলেই সেই আহরিত সূর্যকিরণের আলোকপ্রভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শিক্ষাকে তিনি কুক্ষিগত করে রাখেন নি। বাল্যকাল থেকে তৃষ্ণার্তের মতো গ্রহণ করেছেন বিজ্ঞানের নানা শিক্ষা। এ শিক্ষা চাপানো নয়, আপন গরজে শেখা। সেই সংগৃহীত জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হয়েছে তাঁর কাব্যে, প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, কথায়।

একথা সত্য রবীন্দ্রনাথের লেখায় সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে বিজ্ঞানের আলোক। বিজ্ঞানের সম্পদ লাভ ক'রে তিনি তাকে নিজের মধ্যে জারিত করেছেন, তারপরে সেই জ্ঞানকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। বিজ্ঞান তাঁকে বিস্মিত করেছে। এখানে যদিও কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর প্রভেদ, যেহেতু বিজ্ঞানীর কাছে বিস্ময় বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কবির ক্ষেত্রে তো বিস্ময় প্রকাশের মানা নেই।

মধুমক্ষিকা নানা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে চাকের মধ্যে। অবশ্য তাহলেই সব করা হলো না। নিজস্ব একটি রাসায়নিক দ্রব্যে জারিত করে সৃষ্টি করতে হয় নবতর স্বাদের মধু। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। বিজ্ঞানের নানা ভাণ্ডার থেকে নানা জাতের মধু আহরণ করেছেন; জারিত করেছেন নিজের রসে। তারপরে সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা বা কবিতা বহু-ক্ষেত্রে যেখানে বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানের প্রবেশের কোন প্রশ্ন ওঠে না, সেখানেও তিনি প্রয়োজনের ক্ষেত্র রচনা করেছেন এবং বিজ্ঞান থেকে অনায়াসে উপমা সংগ্রহ করেছেন সিদ্ধ সাধকের মতো। তাঁর সমগ্র রচনাবলী পাঠ করলে একথা সহজেই অনুমান করা চলে যে বিষয়েই তিনি চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই চিন্তার সঙ্গে পাশাপাশি রেখায় চলেছে বিজ্ঞান চিন্তা। কল্পনা দৃষ্টির সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। তাই তাঁর রচনায় কখনো এসেছে বিবর্তনবাদের উপমা, কখনো বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের, সৃষ্টিতত্ত্বের, ভূতত্ত্বের, রসায়নের, প্রাণিবিজ্ঞানের ও পদার্থবিদ্যার উপমা।

হৃদয়ের মধ্যে কোন সত্যের উপলব্ধি হলে তাকে প্রকাশ করার তীব্র বাসনা সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা করে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলে পাঠকালীন সময়ে যেদিন জানলেন 'সূর্য পৃথিবীর চেয়ে চোদ্দ লক্ষগুণ বড়' সেদিন তাঁর মনে জেগেছিল অপরিসীম বিস্ময়, যা তাঁর মায়েদের আসরে

প্রকাশ না করে পারেন নি। ড্যালহৌসী থেকে ফেরবার পরও নক্ষত্র-জগতের কথা সান্ধ্য আসরে উৎসাহের সঙ্গে না বলে পারেন নি। প্রথম বয়স থেকেই বিজ্ঞানের বিষয় থেকে আহরিত জ্ঞান সকলকে জানিয়ে একত্রে আনন্দ অনুভব করার মধ্যে কবির বিজ্ঞানপ্রীতির পরিচয় বহন করছে। বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কার বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের দেশের অন্য কোন কবিকে এমন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে নি। এ প্রসঙ্গে বিদেশের তিনজন মহাকবির নাম উল্লেখযোগ্য—তাঁরা হলেন,—সেক্সপীয়র, শেলী, গ্যেটে। তিনজনেই তাঁদের যুগের গণ্ডী অতিক্রম করে মহাকালের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করেছেন। তার মূলে তাঁদের বৈজ্ঞানিক মন। শেলীর 'To a Skylark', 'The Cloud' কবিতা যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁদের কাছে ঐ অকালজীবি মহাকবির বিজ্ঞানপ্রীতির কথা বিস্তৃতভাবে বলবার প্রয়োজন হবে না। আর, সেক্সপীয়ারের কাব্যে ও নাটকে আইন, ডাক্তারী, নৌবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা সব কিছুরই ছড়াছড়ি।

বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ করা ছাড়াও কবির একটি বিশেষ ধর্ম ছিল। তা হলো অনায়াসে রহস্যের গভীরে নিমগ্ন হয়ে সত্যের সন্ধান লাভ করা। অন্তর্নিহিত সত্যদৃষ্টি—অথবা আবিষ্কারের দৃষ্টি—তা বিজ্ঞানীর। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সেই পরম ধনে সমৃদ্ধ ছিলেন।

রবীন্দ্র-কাব্যে বিজ্ঞান : প্রথম পর্ব

চতুর্দশ বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবিকাহিনী'তে একটি অপূর্ব লাইন রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে নিহিত। চরণটি হলো—'নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান'। দিবালোকে সবই সুস্পষ্ট। বিজ্ঞানের রাজ্যেও প্রতিটি বক্তব্য পরিষ্কার। তার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই। তথ্য ও প্রমাণের আলোকে তা উজ্জ্বল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবির বিজ্ঞান-স্পৃহাও বাড়তে লাগলো। প্রভাত-সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে জন্মদিন পর্যন্ত নানা গ্রন্থে বিজ্ঞানের নানাবিধ তত্ত্বের সার্থক প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। অতি নিপুণ শিল্পীর পক্ষেই তা সম্ভব।

'প্রভাত-সঙ্গীতে'র (১২৮৮ খৃঃ) অন্তর্গত 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতাটির নাম তার বাণী বহন করছে। জগৎ সৃষ্টির রহস্য কবিকে বারবার বিস্মিত করেছে। তা ছাড়া বিশ্বজোড়া নিয়মের রাজত্ব দেখেও তিনি বিমূঢ়। সৃষ্টির রহস্য তিনি অনুসন্ধান করেছেন বিজ্ঞানের পুঁথির মধ্যে, পুরাণের কল্পলোকে। কবি লিখেছেন—

'থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল
নিভে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস
গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিভাইল নিজের হুতাশ'

এই চরণগুলি বিজ্ঞানের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গ্রহসৃষ্টি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা অনেক মতবাদ বেঁধেছেন। কোন্‌টি নির্ভুল তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। কারণ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অনেক মতবাদ পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন কোটি কোটি দলবাঁধা নক্ষত্র নিয়ে রচিত হয়েছে বিশ্বজগৎ। আমাদের সূর্য তাদেরই অন্তর্গত একটি নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে তাকালে

মনে হয় নক্ষত্রগুলি স্থির হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আলোর বর্ণালী পরীক্ষায় জানা গেছে যে কোন নক্ষত্র স্থির হয়ে নেই, তারা ক্রমাগত ছুটে চলেছে। একটি নক্ষত্র থেকে আর একটির দূরত্ব বা ব্যবধান কোটি কোটি মাইল। তাই তাদের পক্ষে পরস্পরের কাছে চলে আসা অতি বিরল ঘটনা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার জেমস্ জীনস্ অনুমান করেছিলেন এই বিরল ঘটনা ঘটেছিল প্রায় দুশো কোটি বছর আগে।

একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র ভেসে এসেছিল সূর্যের কাছে। এই বিপুলাকৃতির নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে সূর্যের মধ্যে উত্থিত হলো এক বিরাট ঢেউ। তা জ্বলন্ত বাষ্পের। আগন্তুক নক্ষত্রটি সূর্যের যত কাছাকাছি আসতে লাগলো, ঐ তরঙ্গও ততো প্রবল হয়ে উঠলো। ক্রমে প্রকাণ্ড একটা অগ্নি-বাষ্পের টানাসূত্র (Filament) সূর্যের পিঠ থেকে বেরিয়ে অগ্রসর হলো আগন্তুকের দিকে। টানাসূত্রটি অনেকটা পটোলের মতো। মাঝখানে ফোলা আর দু-পাশে অপেক্ষাকৃত সরু। যেমনি আকস্মিকভাবে নক্ষত্রটি সূর্যের কাছে এসে পড়েছিল, তেমনি হঠাৎ একসময় তা দূরে সরে গেল। কিন্তু অগ্নিময় টানাসূত্রের পক্ষে আর সূর্যদেহে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হলো না। সূর্যের আবর্তনের বেগ গ্রহণ ক'রে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা শুরু করলো। ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন অগ্নিময় অংশ তেজ হারিয়ে ঘন হ'তে আরম্ভ করে। তখন বাষ্পপিণ্ড ভেঙে বিভক্ত হলো ক্ষুদ্রতর অংশে। অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে তাদের মধ্যে যে বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তার সঙ্গে সূর্যের প্রবল আকর্ষণী শক্তির সামঞ্জস্য হয়ে যে বেগ থাকলো, তার ফলশ্রুতিতে অংশগুলি ঘুরতে শুরু করলো সূর্যের চারপাশে। ছোট-বড়ো টুক্‌রোগুলি এক একটি গ্রহ। আমাদের পৃথিবীও তাদেরই এক শরিক। টুক্‌রোগুলি ক্রমশই তেজ ছড়িয়ে দিতে লাগলো—ঠাণ্ডা হলো। প্রথমে এল জল, কারণ বায়বীয় পদার্থ শীতল হ'লে প্রথমে জলে পরিণত হয়, পরে আরো ঠাণ্ডা হ'লে কঠিন হয়। যদিও সমস্ত বায়বীয় পদার্থ কঠিন বা তরল হয় না, কিছু বায়ব আকারেই থাকে। ধীরে ধীরে পৃথিবী যখন আরো ঠাণ্ডা হলো, তখন বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জমে তরল হয়ে সমস্ত ঢালু জায়গা ভর্তি করে দিল। পূর্বের উদ্ধৃত কবিতাটি থেকে আরো কয়েকটি চরণ তুলে দেখা যাক্—

জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর
...   .
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হতেছে চুরচুর।
অগ্নিময় মিলন হইতে
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান
অন্ধকার শূন্যমরু মাঝে
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।

সূর্য এবং তার প্রতিটি গ্রহ নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরছে। পৃথিবীর পিণ্ডটি জমে তরল হওয়ার আগে একটা ছোট বিক্ষোভ ঘটে। ঐ বিক্ষোভের ফলে জন্ম নিয়েছে চাঁদ। বায়বীয় অবস্থায় যে সমস্ত খণ্ডগুলি সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তাপ হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘন হলো। ঘন হওয়ার জন্যে ভিতরে চাপ গেল বেড়ে এবং নিজেদের মেরুদণ্ডে ঘোরার গতি দিল বাড়িয়ে। কোন জিনিস যদি কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রের চারদিকে চক্রাকারে ঘোরে, তবে ঐ বস্তুর মধ্যে একটা বিপরীত শক্তি জেগে ওঠে। এই শক্তি কেন্দ্র থেকে বাইরে ছিট্‌কে নিয়ে যাবার শক্তি। ঘূর্ণনের বেগ যত বাড়ে, কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) শক্তি তত বৃদ্ধি পায়। বায়বীয় অবস্থায় ঘোরার বেগ যদি অত্যন্ত বেশি হয় তাহলে এই শক্তির প্রভাবে বাষ্পপিণ্ড থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ছিট্‌কে বেরিয়ে আসা সম্ভবপর। ক্ষুদ্রতর খণ্ডগুলি বাষ্পপিণ্ডের আকর্ষণ-মণ্ডল অতিক্রম করতে না পারলে তারই চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে। আমাদের পৃথিবী থেকেও একটি টুকরো ছাড়া পেয়েছিল—তার নাম চাঁদ। কিন্তু সে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিকে উপেক্ষা করে চলে যেতে পারে নি, তাই ক্রমাগত তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতার একস্থানে এই মহাসত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কবি বলেছেন—

'চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা
চক্র পথে রবি শশী ভ্রমে'

এই প্রসঙ্গে লাপ্লাসের নীহারিকাতত্ত্ব স্মরণযোগ্য। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নীহারিকাতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। লাপ্লাস তাঁর বিখ্যাত 'Exposition du Systéme du Monde'-এ যা বলেছেন কবি সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। লাপ্লাসের নীহারিকাতত্ত্ব, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব-জাত গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষাবদ্ধ আবর্তননীতির কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতায়। লাপ্লাস তাঁর গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'From a consideration of the planetary motions we are brought to the conclusion that in consequence of an excessive heat, the solar atmosphere originally extended beyond the orbit of all the planets, and that it has successively contracted itself within its present limits,' এবং 'We may, therefore, suppose that the planets were formed at its successive limits, by the condensation of zones of vapours, which it must, while it was cooling have abandoned in the plane of the equator'.)

সোনার তরী (১৩৩০) কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। 'বসুন্ধরা' এবং 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা তাদের অন্যতম। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। 'প্রভাতসঙ্গীতের' পর থেকে 'মানসী' পর্যন্ত কবির কাব্যে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মচিন্তাধারার সার্থক প্রকাশ ঘটেনি বা কবির দৃষ্টি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক হয় নি। 'সোনার তরী' পর্বে তা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কোন এক সমালোচক তাঁর গ্রন্থে[৩] বলেছেন, 'বিজ্ঞান-আশ্রয়ী যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে কবির এই একাত্মতা-তত্ত্বের বাইরের দিক থেকে (৺অজিতকুমার চক্রবর্তীর আলোচনাক্রমে) একটা মিল দেখা গেলেও অমিল গুরুতর। কারণ, সংগ্রাম, বিরোধ এবং আত্মকেন্দ্রিকতামূলক জীবধর্ম ঐ অভিব্যক্তির মূলে। কিন্তু কবির অভিপ্রেত মহাআত্মীয়তাবন্ধন

৩ রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাস।

অনুভব নিশ্চয়ই সর্ববিধ জৈব-সম্পর্কমুক্ত স্বার্থলেশহীন আত্মবিলোপময় মিলনের বা পশ্চাতে প্রত্যাবর্তনের আগ্রহ, অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা নয়। যাই হোক, কবির এ মনোভাব কোন তত্ত্বের মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। এ আশ্চর্য কবি কল্পনা মাত্র।'

সমালোচক এখানে অভিব্যক্তিবাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা যাচাই করে দেখেন নি। হয়ত তিনি একটি মাত্র দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, তা হচ্ছে ষ্ট্রাগল ফর্ এক্‌জিস্‌টেন্স্ অ্যাণ্ড সারভাইবাল্ অব দি ফিটেষ্ট, কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের এইটেই একমাত্র বক্তব্য নয়। বিভিন্ন সময়ে ডারুইন, মেণ্ডেল, পোস্ট-ডারুইনিয়ানরা নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্রমবিবর্তন প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সন্ধান নিতেন তা তাঁর বক্তব্যেই প্রমাণিত হয়—'জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয় নি। স্যার রবার্ট বলের বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্বস্, ফ্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি—গলাধঃকরণ করেছি শাঁস সুদ্ধ, বীজ সুদ্ধ। তার পরে এক সময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হাক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা।'[৪]

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের বক্তব্যও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য : 'জীবতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় বিষয় ছিল। বংশানুক্রম ও জন্মান্তরীণ সংস্কার নিয়ে একদিন আলোচনা হয়েছিল—দেখেছি তাতে প্যাভলভের গ্রন্থি-ক্ষরণতত্ত্ব বা ওয়াটসনের আচরণতত্ত্ব সম্পর্কীয় রচনাবলীর সঙ্গেও কবির অপরিচয় নেই। জুলিয়ান হাক্সলি, হলডেন প্রমুখের রচনাবলী ত আমিই দেখেছি তাঁকে পড়তে।'[৫]

ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদে আছে—এক আদিম জীবকোষ থেকে ক্রমে ক্রমে এই বিচিত্র জীবদেহ জন্মলাভ করেছে। প্রাচীন অ্যামিবা থেকে আরম্ভ ক'রে মানবদেহ পর্যন্ত সর্বত্রই আছে 'প্রোটোপ্লাজমিক সেল্'। অবশ্য মানবদেহে এর আকৃতি ভিন্নতর। কারণ মানবের মস্তিষ্কে এই কোষ অত্যন্ত জটিল ব্যূহ রচনা করেছে।

---

৪ বিশ্বপরিচয়, ভূমিকা।

৫ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ একটি মাত্র ব্যক্তি নয়, বহু ব্যক্তিত্বের সমষ্টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠিত। এই প্রত্যেকটি ব্যক্তিসত্তার পৃথক বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্মৃতি ও সংস্কার আছে। ডারুইনও একথা মেনে নিয়ে বলেছেন 'An organic being is a microcosm, a little universe, formed of a host of self-propagating organism, inconceivably minute and numerous as the stars in heaven.'

ডারুইন বলেছেন লক্ষ লক্ষ জন্মের স্রোতের ভিতর দিয়ে জীবকোষকে চলে আসতে হয়েছে। কত অবস্থার বিপর্যয়ে কত পরিবর্তন তাকে আঘাত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু নানাবিধ পার্থক্য সত্ত্বেও জীবকোষের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে এবং সে তার জীবনী-ক্রিয়ার একটি অখণ্ড সংস্কারও বয়ে নিয়ে চলেছে। অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে স্যামুয়েল বাটলারও সমশ্রেণীর মন্তব্য করেছেন, 'I suppose, that the fish of fifty million years back and the man of today are one single living being in the same sense or very nearly so, as the octogenarian is one single living being with the infant from which he has grown.' এই মতের পরিবর্তন বর্তমানকালে পরিদৃষ্ট হলেও সোনার তরী বা চিত্রার যুগে পরিবর্তিত তথ্য প্রাধান্য লাভ করেছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এবারে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করা যাক্। আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করেছেন। কিন্তু যখন তিনি তা বিশদভাবে করেন নি তখনও তাঁর কবিতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান 'জীবন দেবতায়' প্রকাশ পেয়েছে। কবির জীবন দেবতা যে নিছক দার্শনিক তত্ত্ব বা কবি কল্পনা নয়, এ যে বৈজ্ঞানিক সত্য তা নিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী অনেক আলোচনা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা ভাবের অনেক সাক্ষ্য যে আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে পাওয়া যায় অর্থাৎ এ আইডিয়াটা যে আধুনিক কালেরই একটি জিনিস

তাহাই দেখাইবার জন্য আজ আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।'[৬] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য অজিতকুমার শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ছিলেন এবং কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মানুষও ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থে 'জীবন দেবতা' অধ্যায় পাঠে রবীন্দ্রনাথ কোন বিরূপ মন্তব্য করেছেন বলে শোনা যায় নি।

১৮৯২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কবি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকালের নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটু খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, বনশিশুর মতো একটা অন্ধ-জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম; এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটতো, এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা ক'রে বর্ষার মেঘ উঠত তখন ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করতো। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।'[৭]

একে তো কল্পনা বিলাস বলা চলে না। এযে প্রখর বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। এই পত্রের সঙ্গে কবিতার অংশ মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন—

---

৬ কাব্য পরিক্রমা।
৭ প্রাচীনভারতে একঃ—ধর্ম।

'প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী
পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমারি স্মৃতি'

এই কথাগুলি ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ স্মরণ করিয়ে দেয় না? ডারুইন পুরোপুরি এই মত গ্রাহ্য না করলেও পোস্ট-ডারুইনিয়ানরা এই যুক্তিকে অস্বীকার করেন নি। ডারুইন বলেছেন যে দেহের প্রতি অঙ্গের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। প্রতিটি জীবকোষের কর্মধারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই প্রতি কোষ একটি স্বতন্ত্র সত্তার প্রতীক। শিশু জন্মলাভের পরে যে সব কাজ অনায়াসে করে তা কিভাবে সংঘটিত হয়? এ তার জন্মগত সংস্কারের ফলে। শিশুর জীবনী প্রক্রিয়া বহু কাল ধরে চলে আসছে এবং সেই অভ্যাস বহু দিনের। আজকের এই শিশুর বিশেষ বিশেষ জীবকোষ বহু যুগ ধরে এক ধরণের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে আছে। কাজেই এই সব অভ্যাসের স্মৃতি তার মধ্যে সংস্কারের আকার ধারণ করেছে। তাই বলে একথা মনে করা ভুল যে বহু জন্ম আগেকার জীবকোষ আর আজকের কোষ একই শ্রেণীর—তাতে কোন প্রভেদ ঘটে নি। কত লক্ষ লক্ষ জন্মের ভিতর দিয়ে তাকে চলে আসতে হয়েছে। কত অবস্থার বিপর্যয়, কত পরিবর্তন তাকে আঘাত হেনেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবুও বহুবিধ পার্থক্য সত্ত্বেও জীবকোষের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে এবং সে তার জীবনী-ক্রিয়ার একটি অখণ্ড সংস্কারও বয়ে নিয়ে চলেছে।

এই পরম সত্যটি বিখ্যাত ডারুইন-শিষ্য স্যামুয়েল বাটলারের ভ্রূণতত্ত্বেও আছে। তিনি জীবকোষের এই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন এবং তার সংস্কারকে 'inherited memory' বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের লেখা, 'প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠে-ছিলুম' এবং 'আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে' কল্পনা-বিলাস নয়। যুগ যুগান্তের সুপ্ত স্মৃতি কবির মনে এক অপূর্ব 'বিশ্বৈক্যানুভূতি'র সৃষ্টি করেছে। এ অনুভূতি কল্পনা নয়, এ বৈজ্ঞানিক সত্য।

মানুষের মনের মধ্যে যুগযুগান্তের একটি লুপ্ত চেতনা বর্তমান—সে চেতনার ধারা অনবচ্ছিন্ন, দৈনন্দিন অভ্যাসের ফলে হয়ত সেই সুপ্ত চেতনা সজ্ঞান লাভ করতে পারে না—এই কথা সর্বপ্রথম বলেন বিজ্ঞানী ফেকনার। বিশ্বজগতে সর্বত্র সর্ববিষয়ে সমধর্মীতা বিরাজমান।

মানবচৈতন্য আবার পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, সূর্য, গ্রহমণ্ডল প্রভৃতির চৈতন্যে মিলে যায়। মানবচৈতন্য ক্রমে জীবচৈতন্যে, জীবচৈতন্য পরিশেষে বিশ্ব-চৈতন্যে উপনীত হয়। কবিকৃত জীবনদেবতার সঙ্গে ফেকনারের তত্ত্বের কি কোন মিল নেই? জীবনদেবতা মানে আর কিছু নয়, একটি 'ক্রমশঃ উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্ব' মাত্র অর্থাৎ 'ever evolving personality'। কবির একটি চিঠি পাঠ করলে এর সঙ্গে সামঞ্জস্য অনুভব করা যায়।

'প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব ক'রে। এই তৃণ-লতাগুল্ম, জলধারা; বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী-চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো; তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়েছে, সেখানে ঝংকার উঠছে। সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হ'ত, যদি প্রাণেও আনন্দে অনন্ত দেশকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত তাহলে কখনোই এই বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হ'তো না। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী হয়ে উঠত।'

প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের এই ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ সর্বানুভূতি বলেছেন। জল-স্থল অন্তরীক্ষকে, সমস্ত মানব সমাজকে নিজের চৈতন্যে অখণ্ড পরিপূর্ণ করে অনুভব করবার নামই সর্বানুভূতি। তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার কল্পনা বা যে দুটি পত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা কল্পনা-বিলাস তো নয়-ই, বরং প্রখর বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত।

এই যে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা কবিকৃত রচনায় প্রকাশ পেয়েছে তার কারণ খুঁজতে গেলে আমরা এ কথাই বলতে পারি যে, হয় কবি পূর্বাহ্নে প্রাণীতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব পড়েছিলেন, নতুবা কবির অন্তর্দৃষ্টিতে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে যার জন্যে কবিদের বলা হয় দ্রষ্টা বা Seer।

'বসুন্ধরা' কবিতায় নিসর্গ বর্ণনাকালে ক্রমবিবর্তনবাদের কথা আছে। কবি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন যে আমাদের জীবনের যাত্রা কেবলমাত্র আজকের নয়। সুদূর অতীতে জড় জগতের মধ্যেও এই প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গিয়েছিল, উদ্ভিদ-জগতে এবং প্রাণীজগতেও এই প্রাণই অভিব্যক্তির বা ক্রমবিবর্তনের স্তরে স্তরে পা ফেলে আসছে। এ কারণেই মানুষের কাছে তৃণের শিহরণ, কুসুম ফুটে ওঠার আনন্দ, সমুদ্রের কলরোল এত অর্থময়, এত পরিচিত।

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধের দ্বারা জীবনের অন্তহীন রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। সেজন্য প্রকৃতির যেখান থেকে প্রাণরস উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, কবি সেখানে প্রবেশ করে উৎসের সন্ধান করতে চান।

'এ জীবন পরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে-অন্তরে-গাঁথা জীবন সমাজ ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়-মাঝে ; কীট পশু পাখি
তরুগুল্ম-লতা-রূপে বারম্বার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে' (বসুন্ধরা)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'জীব সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে মানুষের জন্ম হইয়াছে সর্বশেষে। সেইজন্য মানুষ হইতেছে 'ধরিত্রীর যুবক সন্তান'। কবি বসুন্ধরার স্নেহ নিবিড়ভাবে পান করিয়া লইয়া, তাহার পরে অন্যান্য জ্যোতিষ্কলোকে দূরদূরান্তে সুদুর্গম পথে দেশ-দেশান্তরে পর্যটনে যাত্রা করিবেন।...পৃথিবীর সকল জিনিসকেই ভাল লাগে—(কারণ) সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া একই প্রাণ উদ্বেলিত ও স্পন্দিত হইতেছে।'

এই কবিতায় কবি স্পষ্টই বলেছেন এই পৃথিবী বহু বর্ষের। তার মাটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে অর্থাৎ প্রতিটি প্রাণকে নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে সূর্যকে যুগ থেকে যুগান্তরে। বিবর্তনের প্রায়ান্ধকার যুগে হয়ত তিনি মাটির সঙ্গে মিশে ছিলেন, তাঁর মধ্যে ফুল ফুটত, ঘাস উঠতো। আবার অনেকদিন বাদে হয়ত তিনি সেই প্রাচীন স্মৃতি স্মরণ করতে পারছেন। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে কবি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। অতীতে তিনি পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন, আর ভবিষ্যতে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পুনর্বার নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন।

জন্মের পূর্বে আমরা ভ্রূণাবস্থায় এই মাটির পৃথিবীতে ছিলাম, মৃত্যুতেও সেই পৃথিবীর ধূলোর সঙ্গেই একাত্ম হয়ে থাকবো। আমাদের জীবন-মরণের আশ্রয়স্থল এই পৃথিবী লক্ষ কোটি বছর ধরে তার বুকের উপরকার সমগ্র প্রাণ সমেত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

কবি বলছেন ঃ

'আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্তগগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব ; পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।' (বসুন্ধরা)

এই সুর আবার প্রকাশ পেয়েছে 'ধর্ম' গ্রন্থে। কবি লিখেছেন, 'গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারিদিককে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা। কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতিহীন মহাসূর্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্প-

সংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্বাস—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে—একান্ত নির্জনে রহিয়াছি—শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই।…এই মহা অপরিচিত, যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মত অনুভব করিতেছি।' অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় এই কবিতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। 'বিজ্ঞানের কোন একটি মতবাদের সহিত সুসংগত অথচ পরিপূর্ণভাবে কাব্য, এমন কবিতা প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বকে জানিবার দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষার সহিত অন্তঃপুরবাসিনী ধরিত্রীকে জড়াইয়া থাকিবার ব্যাকুল আগ্রহ টানা-পোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া বিচিত্র এক রসের সৃষ্টি করিয়াছে।'[৮]

'বসুন্ধরা' কবিতার আর একটি অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য।

'মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়।'

অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিবর্তনবাদ রবীন্দ্রনাথের মনকে বারেবারে নাড়া দিয়েছে, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মানুষের জন্ম হলো কি করে তা নিয়ে অনেক তত্ত্ব আছে। একথা সত্য যে জীবের জন্ম কোন জীবন থেকেই। একদিন হয়তো আমরা গাছপালা হয়ে ছিলুম। এমনি সব নানা ভাবনা কবির মনে ঘুরতো। শালবনের নতুন কচি পাতার ভিতর দিয়ে বসন্তের হাওয়া চলেছে। কবির মনে কোন রঙীন কল্পনা এলো না; তিনি যেন বিবর্তনের ঊষাকালে চলে গেলেন মনোরথে। কবি বলছেন, 'অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে…সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের হাওয়া কাহাকেও কোন খবর না দিয়া যখন হঠাৎ হু হু করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি না দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি? তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মতো, মূঢ়ের মতো কাঁপিয়াছি;

৮ রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ (১ম)—প্রমথনাথ বিশী।

আমাদের সর্বাঙ্গ ঝর্‌ঝর্‌ মরমর করিয়া পাগলের মতো গান গাহিয়াছে, আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি ডগা পর্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।'৯

একই কথা পুনরায় বলেছেন, 'আমি তো আজ গাছপালার সঙ্গে বহু প্রাচীন কালের আত্মীয়তা স্বীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়ানোই যে জীবনের সার্থকতা একথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না। আজ আমাদের সেই যুগান্তরের বড়োদিদি বনলক্ষীর ঘরে ভাই ফোঁটার নিমন্ত্রণ……' (ঐ)

অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'অভিব্যক্তিবাদ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? না, কিছুই আকাশ হইতে পড়িয়া হয় না, প্রকৃতিতে কিছুরই হঠাৎ মাঝখানে আরম্ভ নাই।'

'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের যে বিচিত্র স্মৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির কোলে জন্মলাভের যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যেও অভিব্যক্তিবাদের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে।

'আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার—'

অতীত জীবনের স্মৃতি যেন স্মরণ করতে পারছেন। বলছেন:

'মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ
গর্ভস্থ পৃথিবী-পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।'

---

৯ বসন্তযাপন: বিচিত্র প্রবন্ধ।

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধের দ্বারা জীবনের অন্তহীন রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। সেজন্য প্রকৃতির যেখান থেকে প্রাণ-রস উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, কবি সেখানে প্রবেশ ক'রে উৎসের সন্ধান করতে ব্যস্ত।

'যেতে নাহি দিব' কবিতাতেও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত পদার্থের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে এই বোধ প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী তাঁর একটি প্রবন্ধে[১০] লিখেছেন 'আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের' এ কথা কবির কোন বিশেষ মেজাজ বা মুডের ব্যাপার নয়, খেয়াল নয়, অলস মায়া নয়, স্বপ্নরচনা নয়। কোনো বিশেষ মেজাজে কোনো জিনিস একরকম মনে হলে, সে মেজাজ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই একই জিনিস অন্য রকম মনে হয়। তার সঙ্গে এর তুলনা চলবে না। এ সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। লামার্ক, ডারুইন কিংবা হাটন, লাইয়েল, প্রভৃতি জীবিত থাকলে কবির কাছে মাথা নত করতেন, কারণ তাঁরা পৃথিবীর জন্ম বা বিবর্তনের পথে মানুষের আবির্ভাব নিয়ে সে যুগে যা কিছু বিশ্বাস করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস গভীরতায় তাঁদের বিশ্বাসকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রকৃতি যেমন অজৈব পরমাণুকে একত্র করে জীবন্ত কোষে পরিণত করেছে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিও তেমনি বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বাসে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া লাগিয়ে তাকে জীবন্ত করে তুলেছে। এ প্রকৃতি, বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রকৃতি নয়, বিজ্ঞান তথ্যের পথ উন্মুখ করে দিলে সেই পথকে নতুন নতুন বিস্ময়ের পথরূপে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার প্রকৃতি। তিনি বিজ্ঞানী নন, কিন্তু বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা তাঁর মনের ধর্ম।'

'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন—

'ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি। কোনটা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।'

---

১০ রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড, 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান'।

আর একস্থানে আছে—

'কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবল উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে বলিতে পারি না।'

বারবার কবির চিত্তে ধ্বনিত হয় একই কথা যে পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি বস্তু তাঁর চিরসঙ্গী। সৃষ্টির প্রায়ান্ধকার কাল থেকে ক্রমে ক্রমে তিনি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। আজ যখন সেই সৃষ্টি রহস্যের কথা কবির মানসপটে ভেসে ওঠে তখন পৃথিবীর পরিচিত প্রত্যেক কণিকার সঙ্গে তিনি আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করেন।

ছিন্নপত্রে এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি আছে। চিঠিটি হচ্ছে এই: 'এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়।'—ছিন্নপত্র, কলিকাতা ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৩।

সৃষ্টির প্রথম যুগে বাষ্পীয় পদার্থ যখন ক্রমশ জমে তরল হয়ে গেল তখনই সৃষ্টি হলো সাগর ও মহাসাগরের। শুধু জলীয় বাষ্প জমেই তরল হলো, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনিক অ্যাসিড প্রভৃতি গ্যাস অবিকৃত অবস্থায় রইলো। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে একটা স্থায়ীরূপ আসতে দীর্ঘদিন লেগেছে পৃথিবীর। তার মধ্যে তখন প্রচণ্ড তেজ। কোন অংশ জমাট বেঁধে শক্ত হলে মুহূর্তে তাকে ভেঙে তছনছ করেছে। আবার তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। এমনিভাবে পৃথিবীর বুকে অনেককাল ধরে চলেছে অস্থিরতা। ক্রমে তেজের পরিমাণ কমে এল, সেই সুযোগে কঠিন আবরণ স্থির হতে পারলো। অশান্তির মাত্রা যখন অনেক কমে গেল তখনই পৃথিবীর বাইরের আবরণ ঘনীভূত হয়ে শক্ত ও পুরু হয়ে উঠলো। যে জল পৃথিবীকে আপ্লুত করে রেখেছিল তার মধ্যে জন্ম নিল প্রথম প্রাণ।

পণ্ডিতেরা বলেন আর্কেওজোয়েক (Archaeozoic Era) মহাযুগে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। সেই যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমাগত ভাবে চলেছে বিবর্তনের ধারা। কবি জীবনের এই বিপুল অগ্রস্মৃতিকে উপলব্ধি করতে পারছেন যেন। উপরে উদ্ধৃত পত্রাংশের মধ্যে বিবর্তনবাদের এই কথা-গুলিই প্রকাশ পেয়েছে ব'লে মনে হয়।

আমাদের দেশে না হলেও বিদেশের কতিপয় কবির রচনায় বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের কথা প্রকাশ পেয়েছে। টেনিসন তো অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আশ্রয় করে কবিতা রচনা করেছেন। অস্কার ওয়াইল্ডের একটি কবিতায় অভিব্যক্তিবাদের মূল কথাটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

'With beat of systole and of diastole
One grand great life throbs through earths' giant heart
... ...
From lower cells of waking life we pass
To full perfection ; thus the world grows old.'
(Panthae)

পৃথিবীর পরিচিত প্রত্যেক কণিকার সঙ্গে আত্মীয়তাবন্ধন অনুভব করার কথা পরবর্তী কাব্যসমূহেও প্রকাশ পেয়েছে।

চৈতালি (১৩০২-১৩০৩) গ্রন্থের 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় এই সুরের রেশ অনুভব করা যায়।

'আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে ;—ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।'

নৈবেদ্য (১৩০৮) গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় সর্বানুভূতির কথা আছে। 'স্তব্ধতা' কবিতায় আছে—

'শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণু-পরমাণুদের নৃত্যকলরোল—'

একই প্রাণপ্রবাহ প্রতিটি সজীব পদার্থে প্রবাহিত হয়ে চলেছে সৃষ্টির উষাকাল থেকে। যে বিরাট প্রাণের তরঙ্গে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব অনাদিকাল থেকে তরঙ্গায়িত সেই সমস্ত প্রাণের স্পন্দন কবি নিজের দেহে অনুভব করছেন। 'প্রাণ' কবিতায় (নৈবেদ্য) আছে—

করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান ॥
সেই যুগ-যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন ॥

উৎসর্গ (১৩১০) কাব্যের 'প্রবাসী' কবিতায় এই মহাসত্যই উন্মোচিত হয়েছে। এই সংসারের বিচিত্র বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। একারণেই নিজেকে পরবাসী মনে হয় না।

তৃণে-পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে।

এই কবিতাতেই অন্যত্র আছে—

এ সাতমহলা ভবনে আমার চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

কবি বলেন যে, আমাদের এই বর্তমান জীবনের মধ্যে এক চিরন্তন জীবন আছে।

আমার যে জীবন কত যুগ আগে থেকে কত বিচিত্র জীবন পরম্পরার মধ্যে দিয়ে আমার এই বর্তমানতায় এসে পৌঁছেছে, আমার সেই জীবনই

আমার অন্তর্নিহিত জীবন এবং এই ক্ষণিক জীবনের স্বল্প পরিসর চেতনার মধ্যে সেজন্য কবি বিশ্বচেতনাকে এক এক সময় অনুভব ক'রে থাকেন। ১৮৯২ সালের ২০শে অগাষ্ট তারিখের একটি পত্রে (ছিন্নপত্র দ্রঃ) কবির মনোভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেই পত্রের একস্থানে আছে—'এই পৃথিবীর উপর আমার একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে ...'। এই 'আত্মীয়বৎসলতা' কি ভাবে হতে পারে ? বিজ্ঞান বলে লক্ষ কোটি বিভিন্ন বস্তুতে পরিপূর্ণ এই বিশ্বজগৎ। যদি বিভিন্নতার মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র না থাকতো তাহলে মানুষ নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তো। তাই মানুষ চিরকাল বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান ক'রে এসেছে। গাছপালাকে বলা হয় উদ্ভিদ আর মানুষ, পাখী, পশু, কীটপতঙ্গকে বলা হয় প্রাণী। এ ছাড়া অচৈতন্য পদার্থসমূহকে বলা হয় জড়। কিন্তু সকলকেই আখ্যা দেওয়া হয় 'বস্তু'।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ বর্তমান। এই অগণিত শ্রেণী-বৈষম্যের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মহাঐক্যসমন্বিত এক বিশ্বের। বস্তুকে খণ্ড বিখণ্ড ক'রে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে উপনীত হলে অনুভব করা যায় বিশ্বের যাবতীয় বস্তুনিচয়ের মধ্যে বিভেদের প্রশ্নটা যেন প্রায় মিলিয়ে এসেছে। 'প্রায়' বলা হলো এজন্যে যে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু একই রকম নয়—কিছু পার্থক্য বর্তমান। ডালটনের পরমাণুবাদ থেকে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন মৌলের পরমাণু বিভিন্ন। তাহলেও একথা অনস্বীকার্য যে ক্ষুদ্রতম অংশে তাদের বিভেদ নামমাত্র। ডালটন বলেছিলেন পরমাণু অবিভাজ্য। দেখা গেল তা নয়। তাকে ভেঙে অনেক ক্ষুদ্রাকৃতির কণিকা পাওয়া যায়। যে কোন মৌলের পরমাণুকে ভেঙে ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা পর্যন্ত পৌঁছালে তারতম্য আরও টের পাওয়া যায় না।

পরমাণুকে যদিও ভাঙা সম্ভব হয়েছে তাহলেও এ কথা সত্য বলে সবাই মেনেছেন যে এক কথায় মৌলের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু। জড় বা জৈব, চেতন বা অচেতন প্রতিটি বস্তু গড়া পরমাণু দিয়ে। তার চরম উপাদান পরমাণু। গাছের মধ্যে যে নাইট্রোজেনের পরমাণু আছে তার সঙ্গে মানুষের দেহস্থ নাইট্রোজেনের পরমাণুর সঙ্গে কোন অমিল নেই। এমনি ভাবে প্রতিটি সমধর্মীয় পরমাণুতে আছে মিল। এ দিক দিয়ে চিন্তা করলে

পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে নিজের ঐক্য অনুভব করা যায়। মনে হয় এ কারণেই কবি আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করেছেন।

নৈবেদ্যের পরেকার রচনাসমূহ অর্থাৎ খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এক অধ্যাত্মযুগের বৃত্ত। সেখানে বিজ্ঞানের তেমন প্রভাব লক্ষিত হয় না। এর মধ্যে 'খেয়া'র 'প্রতীক্ষা' কবিতা উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় জোয়ারের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি সুস্পষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। চাঁদের সঙ্গে জোয়ার-ভাঁটার যে চিরন্তন সম্পর্ক আছে এই কবিতায় সেই বৈজ্ঞানিক সত্য বিধৃত হয়েছে—

'আজিকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে
নদীর পারে নারিকেলের বনে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে
পড়বে আলো গাছের ছায়া-সনে।
দখিন হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে,
আসবে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে।'

রবীন্দ্র-কাব্যে বিজ্ঞান : দ্বিতীয়পর্ব

'বলাকা' (১৩২১-১৩২২) থেকে আরম্ভ হলো দ্বিতীয় অধ্যায়। এ গ্রন্থের কবিতা গোষ্ঠীর মধ্যে লাগলো বিজ্ঞানের গতিতত্ত্বের হাওয়া। বেশ কিছুকাল ধ'রে যে সব সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মত রসস্নিগ্ধ হয়ে কবির মানসলোকে স্থান পেয়েছিল, তা কবিতার মধ্যে মুক্তি পেল। বলাকার কয়েকটি কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় যেন সমুদ্রের প্রতি, বসুন্ধরা প্রভৃতি কবিতার যুগে চলে গেছি। বলাকার কয়েকটি কবিতা ও গদ্য (সে যুগে লিখিত) প্রবন্ধে তৎকালীন বিজ্ঞানীদের পরমাণুবাদ ও গতিবাদ নতুন ভাবে প্রকাশ পেল। এ কাব্যের কবিতা আলোচনার আগে বিজ্ঞানের এই দিকটি জানা প্রয়োজন।

নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছে এ কথা বলা চলে। অবশ্য তার আগেও বস্তুজগতের অনেক বিষয় বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। আগেকার যুগে শুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। গণিতের নিয়ম-কানুন যে জড়পদার্থের গতিবিধিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখান। দৃষ্টির সামনে যে সব বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখা যাচ্ছে তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে ভবিষ্যতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে তার নির্দেশ করা যায় কি না এই নিয়ে অনুসন্ধানের ফলে গড়ে উঠেছে গতিবিজ্ঞান।

অনুসন্ধানে জানা গেছে পৃথিবীর প্রতি কণা অবিশ্রান্ত গতি সমন্বিত। তার চলার বিরাম নেই। পৃথিবী যেমন গতিশীল, তেমনি সূর্যও। দৃশ্যমান সূর্য, তারা সবাই গতিসম্পন্ন। নিউটনের তত্ত্বানুসারে এই কথা মেনে নিলে আরও একটা প্রশ্ন জাগে। তাঁরই কথা—এমন একটি বস্তু-পিণ্ড কোথাও আছে যা নিশ্চল। পরিদৃশ্যমান সূর্য এবং নক্ষত্ররাজির গতিশীলতার জন্য সেই

বস্তু-পিণ্ডটির স্থান কোথায় তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। নিউটনের এই ধারণাই দীর্ঘদিন বৈজ্ঞানিক জগতে স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

গবেষণার ফলে জানা গেল ইথার এই স্থির বস্তু। ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবী ছুটে চলে। এ কারণেই ইথারে সৃষ্টি হয় আপেক্ষিক গতিবেগ। এই গতিবেগের হিসাব পেলেই পৃথিবীর সত্যিকারের গতিবেগের হিসাব মেলে।

এদিকে আবার প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জড়পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্পর্কে গবেষণা চলছিল। বৈজ্ঞানিকেরা অনেক মৌলের সন্ধান পেয়েছেন— আজ পর্যন্ত একশ তিনটি। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কঠিন, তরল বা বায়বীয় প্রতিটি পদার্থ ই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য বা বায়ুস্বভাব এগুলি নির্ভর করে পরমাণুদের গতি ও পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের উপরে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে টমসন, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসেন যে বিরানব্বুইটি আদিবস্তু (সে সময়ে মৌল পদার্থের সংখ্যা ৯২টি জানা ছিল) আবার দু-টি মৌলিক উপাদানে গঠিত। বিংশশতাব্দীর প্রথমদিকে রাদারফোর্ড এবং অন্য বিজ্ঞানীরা নিউটনের গতিবিজ্ঞান অনুসারে অনুমান করলেন যে সৌর-জগৎ যেমন সূর্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রহরাজির সমাবেশে রচিত হয়েছে, প্রতিটি পরমাণুর গঠনরীতিও সেইরূপ। প্রতিটি পরমাণুর নাভিমূলে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিরাজমান। তা পজিটিভ শ্রেণীর। তাকে ঘিরে ঘুরছে ইলেকট্রনসমূহ। বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্তে এলেন যে দৃশ্যত ঘন কঠিন বস্তুও কয়েকটি গতিশীল অণুর সমষ্টি মাত্র। নিউটনের গতিবিজ্ঞান পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লো না। সৃষ্টি হলো নতুন তত্ব।

গতিবাদ ও পরমাণুবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। মূল বক্তব্য হচ্ছে, কবি বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতি সম্পর্কে মোটামুটি খবর রাখতেন। ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ যেমন নিজস্ব চিন্তাধারা গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি গতিবিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব-দুটিকেই পাশে রেখে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নিজস্ব দর্শন। অভিব্যক্তিবাদনিষ্ঠ গতিবিজ্ঞান তৎকালীন বিদেশী সাহিত্যিকদের চিন্তাজগতে আলোড়ন তুলেছিল। রোঁমা রোঁলা, বার্ণার্ড শ', বারট্রাণ্ড রাসেল, টলস্টয় প্রভৃতি মনীষীর জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে তার হদিশ মেলে।

'বলাকা' সৃষ্টির কিছু পরে ১৯২২ সালে J. A. Thompson তাঁর 'The outline of science' গ্রন্থে লিখেছিলেন—'···There is no such thing as rest. Every particle that goes to make up our solid earth is a state of perpetual unremitting vibration.'

এই চিন্তাধারা বিংশ শতকের প্রারম্ভেই বিজ্ঞানীদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল। বলাকার যুগে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, গতিতত্ত্ব যেমন সত্য, স্থিতিতত্ত্বও তেমনি। তারই জন্য গতিকে আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই পারি না। গতি ও স্থিতির সমবায়ে যে অখণ্ড পরিপূর্ণতার প্রকাশ হয় তাকেই রবীন্দ্রকাব্যের মর্মবাণী বলা চলতে পারে।

বিবর্তন তত্ত্বের মধ্যেও তো গতি বর্তমান। যেহেতু গতি না থাকলে বিবর্তনের ইতিহাস দীর্ঘদিন পূর্বেই স্তব্ধ হয়ে থাকতো। বিবর্তন, উদ্বর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন, সংগ্রাম, মৃত্যু প্রতিটি স্তরের ভিতর দিয়ে প্রাণের গতি-মুখর অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করা গেছে। বিবর্তনের তথ্য সমন্বিত তত্ত্ব তখনকারদিনে অনেক বিদেশী মনীষীকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনি এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার জীবনদর্শন রচনার মূল ভিত্তি। 'বলাকা' এই ভিত্তি-তত্ত্বের, রবীন্দ্র-উপলব্ধিজাত গতিবাদের কাব্যরূপ। এর উপর প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে 'লিপিকায়'। বাইরের এবং ভিতরের অভিব্যক্তিকে কবি উপলব্ধি করেছেন পরবর্তীকালের কাব্য ও নাট্য-পালাসমূহে।

রবীন্দ্রকাব্যে চলার সুর বহু পুরাতন। সেই চলার কথা, গতির কথা কবি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। বলাকার অনেক কবিতায় তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের 'চঞ্চলা' কবিতায় চলার বেগ অনুভব করা যায়।

'হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

... ...

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে,'

সমগ্র কবিতার মধ্যে গতিধর্ম যে অপূর্বভাবে রূপায়িত হয়েছে তা অন্যত্র সুলভ নয়।

কেবলমাত্র গতি-স্থিতিতত্ত্ব নয়, অভিব্যক্তিবাদের কথাও কবি এখানে স্মরণ করেছেন। ক্রমবিবর্তনবাদের মধ্যেও তো সেই চিরন্তন চলার কথা প্রকাশ পেয়েছে। 'চঞ্চলা' কবিতায় সেই মহাসত্যটি পুনরায় বিধৃত হয়েছে।

'মনে আজি পড়ে সেই কথা
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে'

ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করলে কবির এই বক্তব্যের যাথার্থ্য অনুভব করা যায়। প্রাচীনতম মহাযুগ বা আর্কিওজোইক এরা (Archaeozoic Era) শেষ হয়েছে ১১০ কোটি বছর আগে। আরো কত কোটি বছর আগে এর আরম্ভ হয়েছিল তা ধারণা করা শক্ত। এই মহাযুগের বিষয় সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তবে বিজ্ঞানীরা বলেন অ্যামিবা, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি এককোষী প্রাণী, অ্যাল্‌জি, স্পঞ্জ তখন জন্মেছিল। প্রোটারজোইক মহাযুগে এ ছাড়া নতুন কোন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় না। তারপরে দীর্ঘদিন পৃথিবী তুষারাচ্ছন্ন ছিল। হয়তো তার জন্যে বিবর্তন বাধা পায়। এই দুই মহাযুগে পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল জীবের প্রাণধারণের প্রতিকূল। এদের কোন ফসিল পাওয়া যায় না। এর কারণ হয়তো একটা আছে। আগে সমুদ্রের জলে চুনের অভাব ছিল—তারজন্যে সে সময়কার প্রাণীদের দেহের হাড় বা খোলস শক্ত হতে পারে নি। যাই হোক প্যালিওজোইক মহাযুগে এসে জীবজন্তুর বাহুল্য দেখা যায়। অ্যাল্‌জি নামে এক ধরনের শ্যাওলাকে ভূতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাশ বলে চিহ্নিত করেন, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে এই যুগের পাহাড়ে।

প্যালিয়োজোইক (Palaeozoic) মহাযুগে শামুকের মত শক্ত আবরণ-ওয়ালা জীবের চিহ্ন পাওয়া গেল প্রথম। সামুদ্রিক ঘাস দেখা যায় তখন। এই মহাযুগের গোড়ার দিকে ক্যামব্রিয়ান যুগকে ট্রাইলোবাইট্দের-(Trilobite) যুগ বলা যেতে পারে। এ সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে জেলিফিশ্ এবং নানা জাতীয় জলজীব জন্মেছে। অর্ডোভিসিয়ান-(ordovician period) যুগে ট্রাইলোবাইটদের জায়গা নিয়েছে ইউরিপ্টেরিডস্ (Eurypterids)। কাঁকড়াবিছে ও মাকড়সার আদিপুরুষ এরা। এই মহাযুগের শেষপ্রান্তে সিলুরিয়ান যুগে (৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে) মাছের চিহ্ন প্রথম দেখা যায়। সে সময়কার মাছের কাঁটা, চোয়াল শক্ত হয় নি। এ সময় থেকেই প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমবিবর্তনের বেশ বড়ো এক ধাপ এগিয়ে এলো। ডাঙায় বসবাসকারী মেরুদণ্ডী জন্তু জন্ম নিতে আরো কয়েক যুগ লেগেছিল।

এ পর্যন্ত পৃথিবী জলময় ছিল, খুব বেশি ডাঙা সৃষ্টি হয় নি। ধীরে ধীরে জমি উঁচু হয়ে বিস্তৃত হলো। কিন্তু প্রাণের কোন স্পর্শ নেই। একেবারে মরুভূমি। স্থলে গাছপালা শুরু হ'লো সামুদ্রিক ঘাস বিবর্তিত হয়ে। জল সরে গেলে সামুদ্রিক ঘাসের শিকড় গজালো, কাণ্ড শক্ত হলো, ক্রমান্বয়ে বল্কল সৃষ্টি হয়ে ডাঙায় উপযোগী করে তুললো। ডেভোনিয়ান্ যুগের (৩২০ মিলিয়ন বছর আগে) আদিতে রাইনিয়া (Rhynia), হর্নিয়া (Hornea) ইত্যাদি কয়েক ধরনের উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের ফার্ণ, মস্ (moss) এবং অ্যালজির সম্মিলিত রূপ বলা যেতে পারে। গাছের পাতা তখনও হয় নি। এই যুগের প্রান্তভাগে পূর্ণাঙ্গ গাছ ক্রমশ তৈরী হলো। উদ্ভিদের খুব বেশি বিস্তার দেখা যায় কার্বনিফেরাস কয়লার যুগে (২৭৫ মিলিয়ন বছর আগে)। এই সময় পৃথিবীতে জীবের প্রাণধারণের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে।

ডাঙার জন্তু খুব সম্ভবতঃ মাছ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। জল যত শুকিয়ে যেতে লাগলো মাছেরা চেষ্টা করলো স্থলে থাকবার মতো উপযুক্ত হতে। মাছের পাখনা রূপান্তরিত হলো পায়ে, অপরিণত ফুস্ফুস্ শ্বাস নেবার উপযোগী হতে লাগলো। কয়লা যুগের শেষভাগে মাছ থেকে পুরোপুরি চতুষ্পদ জন্তুর সৃষ্টি হয়েছে। তখন মাছ ছিল আমিষ ভোজী, তাই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও

সেই ধারা বর্তমান ছিল। এদের মধ্যে যারা শীঘ্র 'উদ্ভিজ্জাশী' হতে পারলো, এর পরবর্তী যুগে তাদেরই মধ্যে দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

এই সময়ে যে সব জন্তু জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে সরীসৃপ প্রধান। এদের চরম উন্নতি হয় মেসোজোইক মহাযুগে। এরা তখন টিকটিকি, গিরগিটির মতো ছোট নয়—প্রকাণ্ড আকারের। ডাইনোসর, ইগুয়ানোডন্, আর্কিয়োপটেরিক্স প্রভৃতি অতিকায় জন্তুর আবির্ভাব ঘটলো।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন আর্কিয়োপটেরিক্স থেকে পাখির সৃষ্টি হয়েছে। গোড়ার দিকে পাখিরা ঠিক উড়তে পারতো না। ক্রমে শরীর হাল্কা হলো, ডানা বড়ো হলো এবং ওড়বার ক্ষমতা হলো।

কয়লার যুগে গাছ অনেক ছিল কিন্তু ক্রিটেশ্যাস যুগে (১৪০ মিলিয়ন বছর আগে) প্রথম দেখা দিল সপুষ্পক উদ্ভিদ। গাছে ফুল এল। কীটপতঙ্গের সুবিধে হলো। মৌমাছি প্রজাপতি ইত্যাদি নানাশ্রেণীর পোকামাকড়ের সৃষ্টি হলো। ডাইনোসরের মতো অতিকায় জন্তুরা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ধীরে ধীরে লোপ পেল। আজ থেকে প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ী জীবের দর্শন পাওয়া গেল। বাঘ, সিংহ, গরু, ঘোড়া, ছাগল, কুকুর, মোষ, বেড়াল সবাই স্তন্যপায়ী জীব। সেই প্রাচীন স্তন্যপায়ী জীবের সঙ্গে বর্তমানের স্তন্যপায়ী জীবের আকারে যথেষ্ট মিল আছে।

সেনোজোইক মহাযুগের (Cenozoic Era—৩০ থেকে ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে) প্রথম দিকে জন্ম হ'লো বাঁদরের। দশ লক্ষ বছর আগে বনমানুষের আবির্ভাব ঘটে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এদের দেহের পরিবর্তন হ'তে হ'তে আধুনিক প্লিষ্টোসিন যুগে মানুষের আবির্ভাব। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে একধরনের জীবের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হয়েছে। তাদেরই প্রকৃত মানুষ বলে অনুমান করা হয়েছে। তারা আগুনের ব্যবহার জানতো, শীত এবং বন্যজন্তুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারতো। এই হচ্ছে ক্রমবিবর্তনের ইতিবৃত্ত। বিবর্তনের ধারা থেমে থাকে নি—তা ক্রমশ চলছে। এমনিভাবে শ্যাওলা থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে মানুষ জন্ম নিয়েছে। কাজেই প্রতিটি বস্তুকণার সঙ্গে তো মানুষের সম্পর্ক নিবিড়, অচ্ছেদ্য বন্ধনে সে বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথ ক্রমবিবর্তনের এই ধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

তাই অনেকদিন বাদে 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের ৫নং কবিতায় অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা শুনতে পাই।

কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

'এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি ;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি অবসানে
মন্থর গমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে।'

এই সময়ে রচিত 'ফাল্গুনী' ও 'চতুরঙ্গে'র মধ্যেও গতি-স্থিতিতত্ত্বের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

বলাকার এই পর্বে (১৯১৫) কবি নানাকারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কিছুদিনের জন্য নিজের জমিদারী শিলাইদহতে গিয়ে থাকার ইচ্ছা। যাবার সময়ে তিনখানা বই কিনে নিয়ে যান। গান বা কবিতা কোন কিছুরই প্রেরণা পাচ্ছেন না, অতএব পড়ার কাজে মন দিলেন। বইগুলি হলো—

(১) The Pathway to Reality (2 vols. Gifford Lectures) —Haldane.

(২) Interpretation of Radium—Soddy.

(৩) Recent advances in the study of Variation, Heridity and Evolution—Locke.

জমিদারীতে গিয়ে চাষীদের দুরবস্থার কথা ভাবছেন। চাষীর কঠিন পরিশ্রমের ফলে যে ফসল পাওয়া যায়, তা বিপুল হলেও অতি সামান্য। এই প্রশ্ন কবিকে ভাবিত করে তুলেছিল। তাঁর আশা ও বিশ্বাস আছে

একদিন বিজ্ঞান চাষীদের সহায় হবে। তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে একটি পত্রে—

'We all hope that here, science in the end will help man. She will make the necessities of life easily accessible to every man, so that humanity will be freed from tyranny of matter, which now humiliates her. This struggling mass of men is great in its pathos, in its latency of infinite power. (Letters, p-64).

পরবর্তীকালে 'পলাতকা' (১৩২৫, ইং ১৯১৮) কাব্যের কবিতাগুলিতে আবার অভিব্যক্তিবাদের ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। অভিব্যক্তিবাদের পালা মাত্র বৃহত্তর ক্ষেত্রেই নয়, সংসারের ছোট ছোট বৃত্তলোকেও সমভাবে প্রযোজ্য। পুরাতনকে ভেঙে নতুনের সৃষ্টি করা তার কাজ। কবি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। বিবর্তনের ধারা প্রেমের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কবি তা অনুভব করেছেন মহুয়া, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা নাটিকায় ও নৃত্যনাট্যে।

এ সময়ে পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির লীলা, ঋতুর রঙ্গনাট্যকে আশ্রয় করে অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। 'পূরবী' (১৩২৯—১৩৩১) কাব্যগ্রন্থের 'সাবিত্রী' কবিতায় কেন্দ্রীয় সৌরশক্তি এবং বিকীর্ণ আলোর প্রভাবের কথা আছে। সূর্য থেকে গ্রহ-পরিবারের সৃষ্টি। এই পৃথিবীতে কালক্রমে সৃষ্টি হলো প্রাণের। এই প্রাণকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে সূর্যকিরণ। 'সাবিত্রী' কবিতাকে অনেকে সূর্যবন্দনা বলেছেন। এ ঠিক বন্দনা নয়, এখানে কবি সূর্যের সঙ্গে নিজের জীবনের একটা সংযোগ অনুভব করেছেন। এই কবিতার বিভিন্ন স্থান থেকে তিনটি লাইন তুলে ধরা হচ্ছে—

(১) 'তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি'

(২) 'এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান……'

(৩) 'তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে'

বাষ্পের দেহ নিয়ে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছিল সূর্য থেকে। কঠিন হতে লেগেছে বহু যুগ। যখন একটু জমাট বেঁধেছে তখন ভিতরকার বিপুল তেজ

তাকে ভেঙে ফেলেছে। এই অস্থিরপনা চলেছে প্রায় দেড়শ কোটি বছর ধরে। ভাঙা-গড়া চলছিল তখন পূর্ণোদ্যমে। প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর ভাণ্ডারে যে বিপুল তেজ সঞ্চিত ছিল তারই আঘাতে ইলেকট্রন-প্রোটন শ্রেণীর বিদ্যুতকণার মিলন হয়ে সৃষ্টি হলো কার্বনের পরমাণুর। এ এক স্মরণীয় ঘটনা। এই দিন থেকেই সূচনা হলো জৈব জগৎ সৃষ্টির। কার্বনের পরমাণুর আশ্চর্য গুণ যে হাজার হাজার পরমাণুর সংযোগ সাধন করে বিরাটাকার অণু সৃষ্টি করতে পারে। অজৈব পদার্থের অণুর মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা খুব বেশি থাকে না, কিন্তু জৈব অণুর মধ্যে থাকে বহুসংখ্যক পরমাণু। রচিত হ'লো প্রাণের অন্যতম ভূমিকা।

অনেকে আবার বলেন পৃথিবীতে প্রাণশক্তি এসেছে বাইরে থেকে। সৃষ্টির পরে পৃথিবীতে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জল হ'লো, তখনই প্রাণের প্রকাশ পেল। যে সব উল্কাপিণ্ড সময়ে সময়ে পৃথিবীতে এসে পড়ে তাদের পরীক্ষা ক'রে কয়েক ধরনের যৌগিক ও খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব যৌগিক ও খনিজ পদার্থের সন্ধান পৃথিবীতে এখনো সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা বলেন এদেরই মধ্যে আছে প্রাণপদার্থের মূল বস্তু। এই গ্রহের বাতাস ও জলের সংস্পর্শে এসে এগুলি ভেঙে নতুন জিনিস সৃষ্টি করে। ভাঙা-গড়ার সময় যে তেজ ছাড়া পায় তা থেকেই আসে প্রাণের শক্তি। প্রাণের অস্তিত্ব বজায় থাকে বিশেষ উত্তাপের মধ্যে। বুধ গ্রহ সূর্যের অতি কাছে, সেখানে উত্তাপ প্রচণ্ড। কাজেই প্রাণের প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর নয়। তেমনি বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস প্রভৃতি গ্রহেও জীবন থাকতে পারে না যেহেতু সেখানে অত্যধিক শৈত্য। কেবল মাত্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ temperate zone-এ প্রাণ টিঁকে থাকতে পারে। প্রয়োজনীয় উত্তাপ আসছে সূর্য কিরণ থেকে। অতএব এ কথা সহজেই অনুমেয় যে সূর্য থেকেই আমাদের জীবন এসেছে।

এখানে 'পত্রপুট' কাব্যের দশ নম্বর কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃতির যোগ্য।

'বলি—হে সবিতা
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু।'

'যাত্রী' গ্রন্থের একস্থানে কবি লিখেছেন—'সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই তো উৎস-রূপে রয়েছে ঐ মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবী কাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরি বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী। আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবহমাণ।'

উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের মতো মানবজগতেও বিবর্তনের তীব্র আভাস কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। মানুষের দেহ আছে, আছে প্রবৃত্তি আর তার সঙ্গে জুড়ে আছে তার ইতিহাস, সমাজ, সংসার ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এই বিবর্তনতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে, 'অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র, পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়।...যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা।' পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতায় এই তত্ত্বের শিল্পায়ন ঘটেছে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'লিপি' কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয় 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার কথা।

কেবলমাত্র বিবর্তন তত্ত্ব নয়, বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিভাগ কবিকে আকর্ষণ করেছে। খুব সম্ভবত ১৮৮৪ সাল বা তার সমসাময়িক কাল থেকে কবি বিজ্ঞানের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁকে বিশ্বের বিরাটত্বের ধারণাগঠনে সাহায্য করেছে। রসায়ন, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা তাঁকে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে লুক্কায়িত অনন্ত রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছে। ইতিমধ্যে পরমাণুর উপাদান রহস্য জানতে পারা গেছে। পজিটিভ এবং নেগেটিভ তড়িৎ মিলে পরমাণুকে উদাসীন অবস্থায় রাখে এ তত্ত্ব কবি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। ১৯০২ সাল থেকে পরমাণুর গঠন জানবার চেষ্টা চলছিল বিজ্ঞানীদের মধ্যে। এর আগে টমসন পরমাণুর পরিবারে ইলেকট্রনের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। ১৯১৯ সালে জানা গেল পরমাণু দুই ধরনের তড়িৎ দিয়ে গড়া। কেন্দ্রে আছে প্রোটন যা পজিটিভ বৈদ্যুত সমন্বিত আর তার চারপাশে ইলেকট্রনের অঙ্গে নেগেটিভ বিদ্যুৎ। এরা পরস্পর

বিরোধী। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'নটরাজ'। তারমধ্যে একটি গানে 'বিদ্রোহী' শক্তিতে (দুই বিপরীত ধর্মী শক্তি—পজিটিভ ও নেগেটিভ) গড়া পরমাণুর উল্লেখ আছে। গানটির একটি কথা হলো—'নৃত্যের বশে সুন্দর হলো বিদ্রোহী পরমাণু'—এ প্রসঙ্গে বিশ্বপরিচয় থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য। 'অতি-পরমাণুদের দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্বে আছে শান্তি। ভালুকওয়ালা বাজায় ডুগডুগি, তারি তালে ভালুক নাচে, আর নানা খেলা দেখায়। ডুগডুগিওয়ালা যদি না থাকে, পোষমানা ভালুক যদি শিকল কেটে স্বধর্ম পায় তা হ'লে কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে চারদিকে অনর্থপাত করতে থাকে। আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগডুগির ছন্দে চলছে সৃষ্টির নাচ ও খেলা। সৃষ্টির আখড়ায় দুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব মিলিয়ে বিশ্বচরাচরের রঙ্গভূমি সরগরম করে রেখেছে।'

নটরাজের পর কবির মন ঋতুরঙ্গশালার নানা নট বা তরু বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যারা ছিল নামহীন, তারা প্রাণ পেল কবির কাব্যে। বৃক্ষ বন্দনায় (৯ই চৈত্র, ১৩৩৩) বিশ্বে তরুর স্থান নির্দেশ করেছেন তিনি। বিজ্ঞানের তথ্যকে অপূর্বভাবে তত্ত্বে রূপায়িত করেছেন তিনি। বৃক্ষবন্দনা দিয়ে সূত্রপাত হলো 'বনবাণী'র (১৩৩৩—১৩৩৪)। এখানে কবির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের আত্মীয়তা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

'বনবাণী' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'আমার ঘরের আশেপাশে যে সব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছালো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীব জগতের আদিভাষা। তার ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়—তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।'

বৃক্ষবন্দনায় উদ্ভিদতত্ত্বের একটি বড়ো কথা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ভিদকুলের প্রাণ অব্যাহত রাখার জন্য সূর্যের ভূমিকা অসীম। সূর্যের আলোর সাহায্যে সৃষ্টি হয় গাছের খাদ্যবস্তু। মাটি থেকে শোষিত জল এবং বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পত্ররন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে পাতার মেসোফিল

কোষে সঞ্চিত হয়। কোষের মধ্যে আছে ক্লোরোপ্লাষ্ট কণা। এই কণা সূর্যের শক্তি শোষণ করে এবং এই শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করে। পরে জলের অণুকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কণিকায় ভেঙে দেয়। এই সময়ে অক্সিজেন বেরোয় এবং তা মানব তথা জীবকুলের অতি প্রয়োজনীয়। হাইড্রোজেন কণিকা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে মিশে ফসফো-গ্লিসারিক-অ্যাসিড নামে এক যৌগ পদার্থের সৃষ্টি করে। এই যৌগপদার্থটি অনেকগুলি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দ্রাক্ষাশর্করায় রূপান্তরিত হয়। দ্রাক্ষা-শর্করার মধ্যে সূর্যালোকের শক্তি স্থিত অবস্থায় মজুত থাকে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ফোটোসিন্থেসিস বা সালোকসংশ্লেষ।

এই ভাবে গাছ সূর্যালোক নিজের দেহে ধরে রাখে। জীবজন্তু নির্ভর করে নানা জাতীয় গাছের ওপরে। নিরামিষাশী জন্তুরা ঘাস, ছোট গাছ, খেয়ে জীবন ধারণ করে। মানুষ শস্য এবং আরো কয়েক ধরনের গাছ তার খাদ্যতালিকায় রেখেছে এবং উদ্ভিদভোজী জন্তুদেরও আহার্যরূপে গ্রহণ করেছে। কাঠে আগুন ধরালে যে আলো ও তাপ বেরোয় তা সূর্যের তেজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনি ভাবে সূর্যের শক্তি গাছ থেকে মানুষের দেহে আসছে। জীবের ধ্বংস হলে সেই ধ্বংসাবশেষ আবার মাটিতে যায়, সেখান থেকে গাছ পায় প্রাণধারণের শক্তি। এভাবে রচিত হয়েছে এক 'চক্র'। সূর্যের আলো না থাকলে পৃথিবী পরিণত হতো মরুভূমিতে। গাছ যে জীবজগতের অতি উপকারী বন্ধু তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কবি 'বৃক্ষবন্দনায়' রেখেছেন—

'জেনেছি সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ ; ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে-তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎ জয়ী, দিলে তারে পরম সম্মান ;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী—সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা।

বিশ্বপ্রাণের তত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে কবি ব্যক্তি-সত্তার আসক্তিকে ভুলতে চেষ্টা করেছেন। 'পরিশেষ' (১৩৩৭-১৩৩৯) গ্রন্থের 'আমি' কবিতার মধ্যে এই তত্ত্বটির প্রকাশ হয়েছে। বিশ্বচেতনার লাভে ব্যক্তি চেতনার বোধটি লুপ্ত হয়ে গেছে। কবি বুঝতে পারছেন যে তিনি আজ এই পৃথিবীতে বিরাজ করলেও, তিনি আজকের নন। এই পৃথিবীতে কত মূর্তিতে তিনি এসেছেন।

'এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাবার
কত বারংবার'

সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকণার সঙ্গে যে আমাদের নাড়ীর যোগ আছে তা কবি আবার স্মরণ করেছেন 'জন্মদিন' (পরিশেষ) কবিতায়। তার কয়েকটি চরণ এখানে উল্লেখযোগ্য।

'এই বিশ্বসত্তার পরশ
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি' লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে
জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায়,
বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়।'

'পুনশ্চ' (১৩৩৯) গ্রন্থের 'শিশুতীর্থ' কবিতায় বিশ্বসৃষ্টি রহস্যের উপলব্ধির চমৎকার কাব্যরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

'বিচিত্রিতা' (১৩৩০) কাব্যগ্রন্থের মূল সুর একই। সমগ্র বিশ্ব-লোক ঘিরে যে প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে, সেই অসীম প্রাণ-স্পন্দনে কবির প্রাণ যখন পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যীভূত হয়েছে তখনই ব্যক্তি চেতনার অচিন্তনীয় ব্যাপ্তিতে কবি মুক্তির উল্লাস বোধ করেছেন। কবি বলেন, 'নিখিল বিশ্ব জুড়ে প্রাণের যে নিত্য প্রবাহ বয়ে চলেছে, মানুষের প্রাণ তারই একটি অচিন্তনীয় ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। মৃত্যুতে প্রাণ অনন্তপ্রবাহে মিলে যায়। অনন্ত প্রাণের যোগে সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যে আপনাকে লীলায়িত দেখে মানুষ আশ্বস্ত হয়।' এই গ্রন্থ রচনার সময়ে 'মানুষের ধর্ম', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের

দেশ', 'বাঁশরী' প্রভৃতি রচিত হয়। এর মধ্যে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে বিজ্ঞানবুদ্ধি। বীথিকা (১৩৪১-১৩৪২) গ্রন্থের 'আদিতম' কবিতায় কবি 'প্রাণের প্রথমতম কম্পন' অনুভব করেছেন।

'শেষসপ্তক' (১৩৪২) কাব্যগ্রন্থের 'সতেরো' নম্বর কবিতায় পরমাণুর আকৃতি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কবিতায় আছে—

'অনু পরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র
নাচছে সেই সীমায় সীমায় ;
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ।'

অণুতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী। অণু আবার গঠিত পরমাণু দিয়ে। এরা ঘুরছে নির্দিষ্ট পথে। পরমাণুর মধ্যে আবার বিশেষ চক্রপথ আছে, বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন 'অরবিট' (orbit)। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন। তার চারপাশে কক্ষপথে দুরন্ত বেগে ঘুরছে ইলেকট্রন কণার দল। কক্ষপথ চক্রাকার এবং তা নির্দিষ্ট। প্রোটন পজিটিভ বৈদ্যুতকণিকা নিউট্রন তড়িৎবিহীন কিন্তু ওজনে প্রোটনের সমান। ইলেকট্রন নেগেটিভ বৈদ্যুতকণিকা। পরমাণুর মধ্যে আর একটি কণিকা আছে তার নাম পজিট্রন। সেটিও পজিটিভ তড়িৎবিশিষ্ট এবং তার ওজন ইলেকট্রনের ওজনের সমান। পরমাণুর মধ্যে পজিটিভ তড়িৎ এবং নেগেটিভ তড়িতের মাত্রা সমান বলে সে থাকে উদাসীন অবস্থায়। তাই বলে তার তেজ বিনষ্ট হয় না। বিজ্ঞানীরা পরমাণুর কেন্দ্রে বিপ্লব ঘটিয়ে তার ঘুমিয়ে থাকা প্রচণ্ড তেজ বের করে নিয়ে এসেছেন। বিজ্ঞানে আরো জানা যায় বিভিন্ন পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় মিলিত হয়ে গড়ে তুলছে নতুন নতুন বস্তুর অণু। বিজ্ঞানের এই দিকটা কবির সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ছিল। 'শেষসপ্তক' গ্রন্থের 'তুমি প্রভাতের শুকতারা' কবিতায় এক অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ভাবরসের সৃষ্টি হয়েছে। সুদূরের রহস্যময় শুকতারার সঙ্গে কবি এক নিগূঢ় প্রীতির বন্ধন অনুভব করেছেন। শুক্রগ্রহকেই শুকতারা বলা হয়। গোধূলির দেহলিতে, সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে রক্ত অবগুণ্ঠনের নীচে শুকতারা দেখা দেয়। কবি বলেন হেমন্তের শিশিরবিন্দুর

সঙ্গে, শরতের শিউলির সঙ্গে এর উপমা চলে। প্রভাতে মানব পথিককে নিঃশব্দে সে সংকেত করে জীবনযাত্রার পথের মুখে, আবার সন্ধ্যায় তাকে চরম বিশ্রামে ফিরে যেতে ডাকে। এই হচ্ছে কবিতাটির মূল বক্তব্য। হঠাৎ কবি শুকতারার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলতে আরম্ভ করলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব এখানে স্থান পেয়েছে, অথচ তার প্রকাশ কী সুন্দর। কবি লিখেছেন—

'পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত,
সূর্য বন্দনার প্রদক্ষিণ পথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী
রবি রশ্মি গ্রথিত দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে'

শুক্রগ্রহই পশ্চিম সন্ধ্যাকাশে সন্ধ্যাতারা এবং শেষরাত্রিতে পূব-আকাশে শুকতারা। মাঝে মাঝে এই গ্রহ এত উজ্জ্বল হয় যে শুধু এর আলোতেই ক্ষীণ ছায়া পড়ে। শুক্রগ্রহকে পৃথিবীর 'সহযাত্রী' গ্রহ বলা যেতে পারে কারণ দূরত্ব হিসাবে শুক্র পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। শুক্র তার নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করতে শুক্রের ২২৫ দিন লাগে। কবি 'তুমি বৃহৎ' কথা বলতে যদি পৃথিবীর থেকে বড়ো মনে করে থাকেন তাহলে সে ধারণা সঠিক নয় কারণ আকারে শুক্র পৃথিবীর থেকে সামান্য ছোট।

এই গ্রহ উজ্জ্বল কারণ এটি সম্পূর্ণভাবে মেঘমণ্ডলে আবৃত। মেঘের উপরে সূর্যালোক পড়লে তা অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিফলিত হয়। এ কারণে উজ্জ্বলতা আসে। 'তুমি মহিমান্বিত' কথাটি হয়তো উজ্জ্বলতাকেই বোঝাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন শুক্রগ্রহের 'দিন'গুলি সম্ভবতঃ আমাদের এক এক মাসের মত লম্বা। বিজ্ঞানীদের এই মতের সঙ্গে, কবির 'রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা দুলছে তোমার কণ্ঠে' লাইনের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

এই কবিতার মধ্যেই আছে 'আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত'। আলোক বিশ্লেষণের সাহায্যে শুক্রাকাশের মেঘাবরণের উপরাংশে অক্সিজেন গ্যাসের অস্তিত্ব তো পাওয়াই যায় নি, বরং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রচুর আছে বলে জানা গেছে। এই অবস্থা জীবনধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কবি এ তথ্য জেনেই হয়তো কবিতায় ঐ কথা লিখেছেন, কিন্তু মনে হয় এর সত্যতা প্রমাণিত হয় নি। পণ্ডিতেরা বলেন শুক্রগ্রহে উদ্ভিদ ও জীবের অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব এমন কথাও জোর দিয়ে বলা চলে না।

'পত্রপুট' (১৩৪২-১৩৪৩) গ্রন্থের 'পনেরো' নম্বর কবিতায় প্রাণের সৃষ্টি রহস্যের কথা কবি আবার বলেছেন। পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি তিনি নিজের অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে যে তেজোময় লহরী তাঁর নাড়ীতে অনির্বচনীয়ের স্পন্দন এনেছে তা তিনি অনুভব করেছেন নিজের মধ্যে। বলেছেন—

আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন অস্পষ্ট বার্তা
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ'

'পৃথিবী' কবিতায় কবি পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের ও বিজ্ঞানের আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছেন। বলেছেন—

'স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী
তুমি নিত্যনবীনা
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যূষে ;
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ',

এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত (পত্রপুট) 'উদাসীন' কবিতায় চাঁদ সম্পর্কে সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। এই কবিতায় বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং কাব্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। কবি লিখেছেন—

'শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্যনবীন'।

কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেছেন চন্দ্রসৃষ্টিকালে যখন তার দেহ কোমল ছিল তখন তার মধ্যে প্রথমে বহু গ্যাসীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন এক সময় চাঁদে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল ছিল, কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি কম হওয়াতে বায়ুকণাগুলি বেরিয়ে ক্রমে মহাশূন্যে চলে গেছে। বলবিজ্ঞানের হিসাব মানলে চন্দ্রের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ বলে মনে হয়। চাঁদের মধ্যে কালো অংশগুলিকে গ্যালিলিও সমুদ্র মনে করেছিলেন। বস্তুতঃ তা সমতলক্ষেত্র। চাঁদের পিঠে সবুজ রং দেখে অনেকে সেখানে শ্যামল প্রান্তর আছে বলেছেন। হয়তো সেজন্যেই কবির লেখায়, 'তখন ছিল তার রঙের শিল্প'। আর সবুজ মানেই তো চিরনবীন। চাঁদে ঈষৎ গোলাপী রঙের স্থানও অনেকে দেখেছেন—তার নামকরণ হয়েছিল 'সুপ্তি বিল' (মার্স অব্ স্লিপ)।

কিন্তু এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। চিরকাল একই ধারণা বজায় থেকে যেতে পারে না। গ্যালিলিওর ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। চাঁদে সমুদ্র নেই, জলও নেই। একদল পর্যবেক্ষক বলেছেন চাঁদে কোন সবুজ অঞ্চল নেই, তার কোন বায়ুমণ্ডল নেই। চন্দ্র-পৃষ্ঠের পাহাড়গুলি পাশের সমতল ক্ষেত্র থেকে সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে। সুদীর্ঘ ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে। এ তথ্যটি ফুটে উঠেছে কয়েকটি লাইনে—

'আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী'

সাম্প্রতিক কালে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের ফলে চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গেছে, চাঁদের অপর পিঠের ছবিও তোলা সম্ভব হয়েছে।

হয়তো পুরোনো মতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তা আমাদের বিচার্য নয়। তাঁর বেঁচে থাকাকালীন যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল তিনি তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মনে গড়ে তুলেছিলেন অভিনব কল্পলোক।

সমসাময়িক কালে রচিত 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে চাঁদ সম্বন্ধে কবি জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে তথ্য প্রকাশ করেছিলেন তার সঙ্গে এই কবিতার মিল আছে। সেখানে কবি লিখেছিলেন, 'চাঁদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া এত গরম হয়ে উঠেছিল যে চাঁদ তার বাতাসের পরমাণুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের পরমাণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো রকমের প্রাণ টিকতে পারে বলে আমরা জানিনে। চাঁদকে একটা তালপাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।'

এই সঙ্গে 'শ্যামলী' (১৩৪৩) কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতা স্মরণযোগ্য। এ কবিতাটি ম্যাথেমেটিক্যাল গডের প্রতিচ্ছায়ায় রচিত বলে মনে হয়। এখানে বিজ্ঞানকে কাব্য সুষমায় মণ্ডিত করা হলেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিন্দুমাত্র অবমাননা হয় নি।

'পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।'

পৃথিবীর বিপদগণ্ডীর বেশ খানিকটা বাইরে আছে ব'লে চাঁদের খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। পৃথিবীর টানের ফলে চাঁদ আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ঐ বিপদগণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করলে তা হবে টুকরো টুকরো। কবির কথায় 'তখন হবে তার শনির দশা'। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক বিশেষ দিক এমন সহজবোধ্যভাবে মাতৃভাষায় আর কেউ প্রকাশ করতে পেরেছেন কি না জানি না।

জীবন যত সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে লাগলো, বিজ্ঞান চর্চার স্পৃহাও তাঁর বেড়ে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতো অনুসন্ধান করেন। তাই বোধ হয় মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছেন, "...এই সব বই-ই আমার ভাল লাগে—সায়েন্সের বই। কী আশ্চর্য রহস্যময় এই জগৎ। আরো আশ্চর্য তার এতটুকু উদ্ঘাটন। মনে করতে পারো, এই যে হাতখানা এ খালি নৃত্যশীল অণুপরমাণুর সমষ্টি। এই সব বই আমার আরো ভালো লাগে এ জন্য যে মনকে একটা ইম্পার্সনাল অস্তিত্বে, একটা মুক্তির মধ্যে নিয়ে যেতে খুব সাহায্য করে। তুমি আমি কিছু নয়, শুধু আছে নিয়ম আর সংখ্যা।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী)

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার কবিকে বিজ্ঞানের প্রতি আরো আকৃষ্ট করে তুলেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া তাঁর কবিধর্ম। এ কাজে বিজ্ঞান তাঁকে সাহায্য করেছে। তাঁর মনে যে সব মহাজিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে তা ধীরে ধীরে সমাধান করে দিয়েছে বিজ্ঞান। সৃষ্টির বিশাল রহস্য তাঁকে বারংবার বিস্মিত করেছে। প্রচলিত তত্ত্ব দিয়ে সেই রহস্যের সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। 'ছড়ার ছবি' (১৩৪১-১৩৪৪) গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাথরপিণ্ড' কবিতাটিতেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আভাস মেলে।

অনেক যুগের আগে
একটা সে কোন পাগলা বাষ্প
আগুন ভরা রাগে
মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন-পাশ
জ্যোতিষ্কদের ঊর্ধ্ব পাড়ায় করতে গেল বাস।

এই সময়ে রচিত 'সে' গ্রন্থে জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি কবির আকর্ষণ লক্ষণীয়। ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে কবি আলমোড়ায় যান। সেখানে বিজ্ঞানী বশী সেনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে লেখা 'সেঁজুতি'র (১৩৪৩-১৩৪৫) কয়েকটি কবিতায় আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট। তার মধ্যে অন্যতম 'চলতি ছবি' কবিতা। তখন যুদ্ধ চলছে স্পেনে। যুদ্ধের উত্তেজনা, উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে অথচ

লক্ষকোটি অখ্যাত মানুষের খবর কেউ রাখে না। এই কথা বোঝাতে গিয়ে কবি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। জ্যোতিষ্কলোকে নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ অবিরত তাপ ও আলো বিকিরণ করছে। এই তেজ-বিকিরণের তীব্রতা এবং যে দূরত্ব পর্যন্ত আলো ও তাপ ছড়িয়ে পড়ছে তা কল্পনাতীত। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বেদনার হোমাগ্নি-তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে। সবাই তার স্পর্শ পাচ্ছে অথচ বুঝতে পারছে না। যেমন—নক্ষত্রলোকে যে তেজ বিকীরিত হচ্ছে তা দৃশ্যমান নক্ষত্রপুঞ্জকে দেখে বোঝার উপায় নেই।

রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান ঃ তৃতীয় পর্ব

নবজাতকের অধ্যায়ে কবির কাব্যের পালাবদল ঘটলেও প্রকৃতির অনন্ত রহস্যকে জানাবার তীব্র বাসনা ছিল চির অম্লান। নবজাতকের (১৩৪৫–'৪৬) কবিতাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে বিশেষ তিনটি হলো—

(১) বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিক উপকরণকে কাব্য সৌন্দর্য দান করা হয়েছে—'পক্ষীমানব', 'সাড়ে ন-টা', 'ইস্‌টেশন', 'রাজপুতানা' ইত্যাদি কবিতায়

(২) বাস্তবদৃশ্য বা ঘটনার মধ্যে গভীর সত্যের ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে —'অস্পষ্ট', 'প্রজাপতি' ইত্যাদি কবিতায়

(৩) বিশ্বরহস্য জিজ্ঞাসা প্রকটিত হয়েছে কয়েকটি কবিতায়—'কেন', 'প্রশ্ন', 'রাতের গাড়ি'। কবির বক্তব্য এই অধ্যায়ে তাঁর কাব্যে সৃষ্টি বদল হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে মনে হবে কবির কথা আংশিক সত্য। কারণ এই কাব্যগ্রন্থে যে ভাবের কবিতা আছে, সেই ভাবযুক্ত কবিতা নবজাতকের পূর্বের এবং পরের অনেক গ্রন্থে আছে।

সৃষ্টি রহস্য নিয়ে কবি চিরদিন চিন্তা করেছেন। কেন সৃষ্টি কার্য আরম্ভ হলো আর কেমন ভাবেই বা এককোষী প্রাণের সৃষ্টি হলো তা রহস্যের বিষয়। বিন্দুপ্রায় কোষ (Cell) থেকে তাবৎ জীবলোকের সৃষ্টি একথা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অথচ মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনো নীরব। সার জেমস্ জীনস্ 'vital force' এর কথা বলেছেন। সম্প্রতি পরলোকগত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হলডেন বলেছেন কোন 'অতিপ্রাকৃত ঘটনার' (Supernatural event) জন্যে হয়তো এককোষী প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে অধিক প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, পৃথিবী যখন সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয় নি তখন তার জলরাশি ছিল উত্তপ্ত। সে সময় সেই তপ্ত জলরাশির মধ্যে এমন

কোন অবস্থা হয়তো সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে কোষের প্রোটোপ্ল্যাজমের মতো কোন জৈব বস্তু দানা বাঁধতে সক্ষম হয়। তৎকালীন মহাসমুদ্রের জলে ধাতব পদার্থ ছিল প্রচুর পরিমাণে। বায়ুমণ্ডলের বাষ্পীয় চাপ এবং জলের উত্তাপ—দুয়ে মিলে রাসায়নিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এই পরিবেশে জৈবিক প্রোটিনবস্তু তৈরী হওয়া আশ্চর্যের কথা নয়।

জীবের সৃষ্টি হয়েছিল অতি সহজ এবং সূক্ষ্মদেহ নিয়ে। ক্রমবিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে বৈচিত্র্য। বিবর্তনের প্রায় উষাকালে উদ্ভিদ ও জন্তু পৃথক হয়ে যায়। জন্তু থেকে ধীরে ধীরে এলো মানুষ। বিচিত্র তার স্তর। আজ এই পৃথিবী বৃক্ষপত্রে সুশোভিত। সমস্ত প্রাণীজগৎ নতুন জীবনের সৃষ্টি করছে আবার মৃত্যুতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে প্রৌঢ় প্রাণ। কেন এমন হয়? কবির কৌতূহলী মন বারেবারে খুঁজেছে এই অনন্ত রহস্যকে।

'কেন' কবিতায় আছে এই জিজ্ঞাসা—

'একি মহাকাল কল্পকল্পান্তের
দিনে রাতে
এক হাতে দান করে
ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে
কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু, কেন!'

প্রকৃতির অদ্ভুত কার্যকলাপ কবির মনে প্রশ্ন তুলেছে। বিজ্ঞান বলে সূর্য থেকে আলো আসে পৃথিবীতে। পৃথিবী প্রণয়ীর মতো তাকিয়ে থাকে সূর্যের দিকে। তার রশ্মিচ্ছটায় পৃথিবী আলোকিত, আরক্তিম। সূর্য থেকে আলো বিনির্গত হয়ে চলতে থাকে বায়ুমণ্ডলের স্তর ভেদ করে। পৃথিবীর উপরিকার সর্বোচ্চ বায়ুমণ্ডল যেখানে শেষ হয়েছে তারও উর্ধ্বে রয়েছে ইথারের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। এতদূর থেকে আলো আসার পথে বেশ খানিকটে আলো শুষে নেয় অনেক স্তর। শুধু তাই নয় সূর্যের আজ্ঞাবাহী অন্যান্য গ্রহগুলিতেও আংশিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার আলো সামান্য অংশ

মাত্র পৃথিবীকে আলোয় উদ্ভাসিত করে। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। সূর্যের বর্ণালীতে স্থানে স্থানে অসংখ্য কালো রেখা দেখা যায়। আলো শোষিত হবার জন্যে এরকম কালো দাগ পড়ে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ফ্রনহোফার অনেক রেখা আবিষ্কার করেছিলেন।

এছাড়া নকল সূর্যালোক সৃষ্টি করে তার আলো বিশ্লেষণ করলে যে পরিমাণ বেগনি-পারের আলো পাওয়া যায়, সূর্যের বর্ণালীতে ঐ আলো তার চেয়ে অনেক কম মেলে। সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে পোঁছোবার পর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কিছু আলো শোষিত হয়েছে তার মধ্যে থেকে—এই আলোর বেশির ভাগ আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি বা বেগনি-পারের আলো। কবি এই অপচয়কে বিধাতার অন্যায় কার্য বলে অভিহিত করেছেন। কবি বলেন—

'জ্যোতিষীরা বলে
সবিতার আত্মদান-যজ্ঞের হোমাগ্নিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দির মণ্ডপে
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের পরে
... ...
সর্বত্যাগী অপব্যয়
আপন সৃষ্টির পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।'

এই সব কবিতা রচনার কালে দেশের রাজনীতি কবিকে পীড়িত করছিল। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও রাজনীতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়তেন। তাঁর মতামত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো। তৎকালীন রাজনীতির মধ্যে কবি না পেলেন শৌর্য, না দেখলেন বীর্য। কোন বৃহৎ আদর্শ দেখতে পেলেন না—তাই তাঁর ক্ষুব্ধ মন শান্ত হতে চাইলো বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে। কবি-জীবনীকার প্রভাতকুমার কবির সে সময়কার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন যে তখন কবির ইচ্ছা সায়ান্স চর্চা করেন। নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশ ও কালের মধ্যে তীর্থযাত্রা করে ভূমাকে ভোগ করেন। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে

আত্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করবার একান্ত ইচ্ছা জাগে তাঁর মনে। ১৯৩৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর কবি ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে লেখেন, "আমার মন সরে যেতে চাইছে সুদূরে—সেই দূরকে নিজের ভিতরেই সৃষ্টি করবার চেষ্টা করচি। যে বিশ্বজালে অচিন্তনীয় দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোকসূত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব—আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধরা দিয়েছে তার টানে; সে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্যের দিকে যার মধ্যে জীবন-মরণের তাৎপর্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন, সেই তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে কোনো একটা চিরন্তন অর্থ—যে অর্থ বহন করে চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।"

এই পত্রের সঙ্গে ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে লেখা 'প্রশ্ন' (নবজাতক) কবিতার মিল সুস্পষ্ট। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

'চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাশ চক্রপথে ঘুরে
আপনার পানে চাই
লেশমাত্র পরিচয় নাই
একি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্যগতি'

'সাড়ে ন'টা' কবিতাটি অপূর্ব। বেতারের গান শুনে কবির মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জেগেছে। বেতারের গান যে সুদূর আদর্শ লোকের কোন অভিসারিকা। পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্র অতিক্রম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, রাগিণীর দীপশিখা হাতে নিয়ে সে অভিসারে চলেছে একাকিনী। যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূতও একইভাবে কালের সমস্ত বাধা এড়িয়ে ভেসে চলেছে। নিতান্ত গদ্যময় একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়কে অবলম্বন করে কবি এক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেছেন।

এই কাব্যগ্রন্থের 'পক্ষীমানব' কবিতা যন্ত্রের বিরুদ্ধে কবির বিক্ষোভ। এ যেন বর্তমান যান্ত্রিক যুগের প্রতিবাদ। আগে পাখীরা আকাশে ডানা মেলে উড়ত; আকাশ, বাতাস, মেঘের তারা ছিল নিত্যসঙ্গী। তাদের প্রাণ ছিল আকাশের সুরের সঙ্গে বাঁধা। 'মহাকাশের মহাশান্তির সঙ্গে তারা এক ছন্দে, এর সুরে গাঁথা ছিল।' কিন্তু মানুষ ক্ষমতামত্ত হয়ে

আকাশের শান্তি করেছে বিঘ্নিত, হিংসা ও মৃত্যুর অনল ঢেলে তাকে করছে ক্লিষ্ট।

কবির কথায়—

"আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে
হানিছে অট্টহাসে।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে—
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে।"

বিজ্ঞানের যে মহলে শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা সেখানে গভীর কৌতূহল নিয়ে কবি যাতায়াত করেছেন। সেই মহলের নতুন নতুন বাতায়ন উদ্‌ঘাটন তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন। এই বাতায়ন পথে দাঁড়াতে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর দৃষ্টি ডুব দিত গভীরে। কিন্তু বিজ্ঞানের আর একটা দিক আছে—যেখানে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রকাশ ঘটে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে গড়ে উঠেছে শিল্প। সেখানে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি। কবির মনে হতো বিপুল যন্ত্রশক্তি যেন দানবের রূপ নিয়ে এদিকটার সবজায়গা জুড়ে বসে আছে। কবির ভাল লাগে নি। যন্ত্র ও যন্ত্রসভ্যতা নিয়ে কবির মত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বগুলি ছাড়াও তার যেসব সৃষ্টবস্তু আমাদের কাছে অতি পরিচিত তাদের অনেক কাহিনী রসমণ্ডিত হয়ে ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ, কবির নানা কাব্যে। 'জবাবদিহি' (নবজাতক) কবিতায় আছে বর্ণতত্ত্ব। কালো রঙ সব রঙের শোষণে সৃষ্টি হয়—এই সত্যটি কবি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা অনির্বচনীয়।

সকাল বেলা বেড়াই খুঁজিখুঁজি
কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগালো বুঝি
শেষ প্রহরে রঙ হরণের পালা
ওরে কবি, ভয় কিছু নেই তোর—
কালো রঙ যে সকল রঙের চোর।

'প্রজাপতি' কবিতায় উদ্ভিদ-বিদ্যার ফুলের পরাগ-সংযোগের (Pollination) কিছু কথা জানতে পারি।

একজাতীয় ফুলের পরাগরেণু সেই জাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর স্থানান্তরিত হতে পারে অথবা একজাতীয় ফুলের পরাগরেণু সেই জাতীয় অন্য গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই পরাগ সংযোগ হতে পারে। এই বিশেষ কাজের ফলে গর্ভাধান (Fertilization) হয়।

পরাগ সংযোগের জন্য ফুল প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বায়ু, জল, কীট-পতঙ্গ ও প্রাণী—প্রকৃতির এই সব হাতিয়ারের সাহায্যে পরাগসংযোগ সাধিত হয়। যে সব ফুলের বর্ণ উজ্জ্বল তারা আকৃষ্ট করে পতঙ্গদের। যে সব ফুলে মিষ্টরস ও গন্ধ থাকে তাদের কাছে উড়ে যায় মৌমাছি, প্রজাপতির দল। মিষ্টরস ফুলের রসগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। আর এই গ্রন্থিগুলি থাকে সাধারণতঃ যুক্ত পাপড়ির মূলে বা পুষ্পাক্ষের উপর। একবীজপত্রী উদ্ভিদের পুষ্পপুটের ভিতরে মিষ্টরসের গ্রন্থি থাকে। প্রজাপতি, মৌমাছি ঐ রসের লোভে ঐ সব ফুলের উপরে বসে এবং পরাগ সংযোগ সাধনে সহায়তা করে; কলমি, ঝুমকো লতা, রঙ্গন, রজনীগন্ধা, হাসনুহানা, বেললতা, যুঁই প্রভৃতি ফুল প্রজাপতির দ্বারা পরাগ সংযোগ সাধন করে।

'প্রজাপতি' (নবজাতক) কবিতার কয়েকটি চরণ মিলিয়ে দেখা যাক—

'ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে রহস্য জানে না ও কভু।
পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ—
প্রতিদিন করে তাঁর খোঁজ
কেবল লোভের টানে।

বিহারের সেই চিরস্মরণীয় ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'ভূমিকম্প' কবিতাটি এখানে স্মরণযোগ্য।

একদা যৌবনে কবি জীবধাত্রী বসুন্ধরার ক্রোড়ে অবস্থান করে তৃণাঙ্কুর উদ্ভেদের রহস্য অনুভব করতে পেরেছিলেন। এখন বার্ধক্যে কবি পৃথিবীর সংহারিণী মূর্তির কথা ভাবছেন। লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে সব অতিকায়

জন্তুর দল পৃথিবীপৃষ্ঠ আলোড়িত করে তুলেছিল আজ আর তারা কেউ নেই। রোগশয্যায়' (১৩৪৭) গ্রন্থের ১১নং কবিতায় আছে

'প্রাণী কত এসেছিল দলে দলে
জীবনের রঙ্গভূমে
অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে
সে শক্তিই ভ্রম তার
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত করে দেয় মহাভার।'

অতিকায় প্রাণীর দল একদা পৃথিবীর মাটিকে বিকম্পিত ক'রে তুলেছিল। অথচ কালক্রমে তারা অবলুপ্ত হলো ধরাপৃষ্ঠ থেকে। বিবর্তনবাদের এই দিকটির কথা কবি প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়। ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে উপলব্ধি করা যায় এর রহস্য। প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকায় বিরাট আকারের টিকটিকি জাতীয় জীবের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। এদের মধ্যে দুই জাতের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তারা ছিল অত্যন্ত কুদর্শন। আকার ছিল মস্ত লম্বা। প্রায় ৯-১০ফিট। পিঠের উপরে থাকতো বড়ো এক ডানা। মাংস ছিল এদের খাদ্য। ২০ থেকে ১৫ কোটি বছরের মধ্যে এই পৃথিবীর সবগুলি সমুদ্র যায় শুকিয়ে (এ কথাও পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন) মাত্র প্রশান্তমহাসাগরের কোনো কোনো জায়গাতে সামান্য জল ছিল—কুমীর জাতীয় একধরনের জীব মাটিতে গর্ত করে কোনরকমে বেঁচে ছিল, আর সব প্রাণী পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুঝতে না পেরে লোপ পেয়েছিল। তারপরে ১৫ থেকে ১০ কোটি বছরের মধ্যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবসান ঘটে।

সরীসৃপের চরম উন্নতি ঘটে মেসোজোইক মহাযুগে। তারা তখন টিক্‌টিকি-গিরগিটির মতো ছোটো-খাটো জন্তু নয়। তারা অতিকায় জন্তুর রূপ নিয়েছে। পৃথিবী কাঁপিয়ে চলতে লাগলো ডাইনোসর, ডিপ্লোডকাস্‌, ইগুয়ানোডন্‌, ইকটিওসর প্রভৃতি দানবাকৃতির জন্তু। মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমিতে ৬০-৭০ ফিট লম্বা ডাইনোসোরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। মাংস এদের জীবিকা। সেখানে বেলুচিথেরিয়ম নামে এক অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তারা ছিল ১৭-১৮ ফিট উঁচু, ২৪-২৫ ফিট লম্বা। এদের উপরের দাঁত দুটো প্রকাণ্ড শিং-এর মতো, কান হাতির কানের মতো।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই উদ্ভিজ্জভোজী জীব জলজ উদ্ভিদ খেতে হ্রদের জলে নামতো। দেহের বিরাট ওজনের চাপে পা বসে যেত কাদার মধ্যে, আর তুলতে পারতো না। সেখানেই তারা মারা যেত। ৯ কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকায় প্রায় ৯০ ফিট লম্বা ও ৩০ ফিট উঁচু বিরাট জন্তুর আবাস ছিল মনে অনুমিত হয়। তারা আট-দশটা হাতির ওজনের সমান ছিল। দেহের ওজন এত বেশী হওয়ার জন্যে তারা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারতো না।

এসব অতিকায় জন্তুদের ভিতর একটা জিনিস নজরে পড়ে যে এদের শরীরের মধ্যে ব্যবস্থা ভালোরকম ছিল না। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রচুর মালমশলা দিয়ে প্রকৃতি যেন অ্যামেচারী মূর্তি তৈরী করেছে। তাই দেখা যায় যে জন্তু লম্বা ৭০-৮০ ফিট, তার পা অতি সরু। একারণেই পায়ের উপর দাঁড়াতে পারতো না তারা। জীবিকা সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটতো, শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার পন্থা তাদের জানা ছিল না। তাই কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে।

ডারুইন বলেন নিজেদের মধ্যে রেষারেষি এবং অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ প্রাণীই বাঁচতে পারে না। সংখ্যা যত বাড়ে, আহারের অকুলান ততো বাড়ে। তাই প্রতিযোগিতা নেয় হিংস্ররূপ। নিজস্ব সত্তা রক্ষার জন্য যারা উৎরে যায় তারা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুণসম্পন্ন। এই গুণ তাদের বংশপরম্পরায় উৎকর্ষ লাভ করে। ডারুইন একেই বলেছেন 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বা survival of the fittest। সংখ্যা যত বাড়ে—জীবন সংগ্রামও তত বাড়ে। তার ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) দ্রুতবেগে কাজ করে। যারা সংগ্রামে পটু তারাই বেঁচে থাকে, আর তাদেরই কদর বেশী। যৌন-নির্বাচনও এমনি ধারাতেই হয়। নানারকম বাছাই-এর ফলে ধীরে ধীরে একটি ধারা অবলম্বন করে জীবজন্তুর পরিবর্তন হয়, উন্নতি হয়।

ডারুইনের এই Theory of Natural Selection মেনে নিলেন না মেণ্ডেল। মেণ্ডেলিয়ানরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললেন যে পরিবর্তন বা variation যে সর্বদাই কোন ধারা অনুসরণ করে চলবে তা নয়, বিচ্ছিন্নভাবে যে কোন সময়, আকস্মিকভাবে কোন বড়ো ধরনের পরিবর্তন

হওয়া অসম্ভব নয়। ডে-ভ্রীজ তাঁর মতবাদের নাম দিলেন Mutation Theory। তিনি বললেন হঠাৎ পরিবর্তনের জন্যেই জীবজগতের উন্নতি। সে যাই হোক, ক্রমবিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে যেসব গবেষণা হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিটি পদক্ষেপ গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর কবিতায় বিজ্ঞানের এই তত্ত্বেরই প্রতিফলন।

'রোগশয্যায়' কাব্য গ্রন্থের সমসাময়িক কালে রচিত 'আরোগ্য' (১৩৪৭) গ্রন্থেও কবি সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলেছেন। কবি বললেন—

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতসবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা লয়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
একপ্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে-কালে।

পৃথিবীর সাগরতীরে সজ্জিত অগণিত বালুকারাশির মতো বিশ্বলোকের অন্তর্গত নক্ষত্রের সংখ্যা অপরিমেয়। এই বিপুল সংখ্যক নক্ষত্র মহাশূন্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশীর ভাগ একক, কয়েকটি চলে গুচ্ছ হয়ে। এক বিরাট নক্ষত্র একদা সূর্যের কাছে এগিয়ে এলো। কল্পনাতীত একটা বিরাট বাষ্পের ঢেউ উঠেছিল সূর্যপৃষ্ঠে। অবশেষে আকস্মিকভাবে সেই বিরাট ঢেউ গেল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে। অপঘাতের ধাক্কায় সূর্য থেকে যে সব টুকরো বিক্ষিপ্ত হয়ে এসেছিল তা প্রথমে ছিল অতি উষ্ণ; কালক্রমে তেজ হারিয়ে তা হলো শীতল। এই ক্ষুদ্র জড়কণাকে আশ্রয় করে দেখা দিল এক নতুন প্রাণের ধারা। মনে হয় কবি উপরের উদ্ধৃত কবিতায় এই বক্তব্যকেই রূপদান করেছিলেন।

'জন্মদিনে' (১৩৪৮) কাব্যগ্রন্থের ৫নং কবিতায় ক্রমবিবর্তনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণ করে কবি বিবর্তনের ধারা প্রত্যক্ষ করেছেন। সৃষ্টির প্রথমে যখন অগ্নিবন্যাধারা অসীম শূন্য প্লাবিত করেছিল, তখন স্ফুলিঙ্গের মতো তিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করেছিলেন। তারপর পৃথিবীতে জড়পিণ্ড হয়ে কল্পরূপে এবং তারপর

বৃক্ষরূপে রূপান্তরিত হলেন, পরে পশুরূপে। শেষে মানুষ 'প্রাণের রঙ্গভূমে' এলো। পরিশেষে নতুন নতুন দ্বীপে নব নব ভাষাভাষী রূপে বাস করে বর্তমান জীবন গ্রহণ করেছেন। আবার এখান থেকে হয়ত তাঁকে চলে যেতে হবে। কবিতাটি পাঠ করলে মনে হয় যেন কোন বিজ্ঞানী সুনিপুণ-ভাবে ক্রমবিবর্তনের কথা বর্ণনা করছেন।

বিজ্ঞানে কবির বিস্ময়কর ব্যাপ্তি

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সের কালে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের উন্মেষ ঘটেছে। তাঁর জীবনদর্শনের যে মূল সুর সেদিন উপ্ত হয়েছিল তার মধ্যে গুরুতর পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন ঘটেনি কখনো। কবি বিবর্তনবাদে আস্থাশীল ছিলেন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। যে মননশক্তি নিয়ে কবির সত্তা মানবরূপে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে তার সম্ভাবনা পৃথিবীর সমস্ত অণুপরমাণুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল; একথা চিন্তা করতেও কবি আনন্দিত হতেন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভের পূর্বেই প্রকৃতির প্রতি তাঁর এক সহজাত আকর্ষণ ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাধারার সঙ্গে বিজ্ঞানের আশ্চর্য সমর্থন লক্ষ্য করে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়তেন। সে বিস্ময়ের কথা বারবার বলেও যেন তৃপ্তি নেই। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যে আত্মীয়তাসুলভ আকর্ষণ ছিল তা কেবলমাত্র বিজ্ঞানশিক্ষারই ফলশ্রুতি নয়, বাল্যকালে উপনিষদ পাঠও তাঁকে এক বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিল। উপনিষদও তাঁকে দিয়েছিল একের শিক্ষা। প্রকৃতপক্ষে বস্তুর বিভিন্নতা নেই; এক জিনিসই বিভিন্নরূপে অবস্থান করছে মাত্র। কবি বিস্মিতভাবে দেখলেন বিজ্ঞানও তাঁকে এ বিষয়ে সমর্থন জানাচ্ছে। কবি এ সম্বন্ধে বলেছেন, 'জড় হইতে জন্তু এবং জন্তু হইতে মানুষ পর্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে এ কথা আমাদের কাছে অত্যদ্ভুত বোধ হয় না; কারণ বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্বে আমরা অন্তর হইতে একথা জানিয়াছিলাম।'[১১]

তাঁর রচিত কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানের আনাগোনা আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। ছিন্নপত্রের প্রথম পত্রখানাতেই আছে, 'একবার চেয়ে দেখুন কী বিপুল বল।...পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে এই ডাঙায় জলে লড়াই চলছে—ডাঙা ধীরে ধীরে এক-এক পা ক'রে আপনার অধিকার

১১ পঞ্চভূত : সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

বিস্তার করছে…আর পরাজিত সমুদ্র পিছু হটে হটে কেবল ফুঁসে ফুঁসে বক্ষে করাঘাত করে মরছে। মনে রাখবেন এককালে সমুদ্রের আধিপত্য ছিল—তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভূমি তারই গর্ভ থেকে উঠে তার সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে…' পত্রের এই অংশে প্রাকৃতিক ভূগোলের সুন্দর ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এক সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কালক্রমে ঐ সমুদ্রের গর্ভ চিরে প্রকাশিত হয় ভূমিখণ্ড। মানুষ বুদ্ধিমত্তায় প্রখর হয়ে সংকীর্ণ স্থলভূমির অধিবাসী হয়েও জলজগৎকে করছে শাসন। সমুদ্র আজ তার অনতিক্রম্যতার দাবী জানাতে পারে না, সমুদ্র তার জলরাশি বুকে নিয়ে সগর্বে বলতে পারে না সে অতলান্ত। মানুষের মনীষার কাছে তার দম্ভ হয়েছে চূর্ণীভূত। প্রাকৃতিক বিবর্তনের বিবরণ সত্যিই চমৎকারিত্বের পর্যায়ে পৌঁছেচে। আর এক জায়গাতে তিনি এক সুন্দর উপমা দিয়েছেন। বিলের ভিতর দিয়ে তিনি আসছেন। সেই বিল দেখে তাঁর মনে পড়েছে সমুদ্রের বুক চিরে পৃথিবীর জেগে ওঠার কথা। '…বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারী অদ্ভুত, কোন আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার। পৃথিবী সমুদ্র গর্ভ থেকে নতুন জেগে উঠবার সময় যেমন ছিল।'[১২] ছিন্নপত্র গ্রন্থে এমন অনেক পত্র আছে যেখানে কবি নিজেকে পৃথিবীর মাটি—জলের সঙ্গে এক হয়ে থাকার কল্পনা করেছেন।

কবির এই ভাবধারা অনুসরণ করে সহজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কবির বর্তমান অস্তিত্ব এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা—দুটিকেই তিনি তাঁর জীবনে সত্য বলে স্বীকার করে নিলেও তাকে কখনোই চরম সত্য বলে মনে করেন নি। নিজেকে প্রতিবার বিরাট বিশ্বের ক্যানভাসে ফেলে নিজেকে বিস্তৃত করে, প্রসারিত করে নিজের সত্তার বিরাটত্ব উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মনকে প্রসারিত করার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন উপনয়নের পর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবার সময়ে। এ সময়ে তিনি নিজেকে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে অনুভব করতে চেষ্টা করতেন। পৃথিবীর সামান্য ধূলিকণাকেও তিনি তুচ্ছ করেন নি। প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

১২ ছিন্নপত্র : ৯৩, ১৮৯৩

পদার্থের মধ্যেও তিনি অনন্তের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবির কয়েকটি লাইন স্মর্তব্য। '...একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে। একটি পর্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে। ছোট বড় আর কোথায় রহিল! একটি পর্বতও যা, পর্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে, সকলেই সমান।'

কবির এই বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে শুধু কবিহৃদয়ের এক বিশেষ অনুভূতি-ই প্রকাশিত হয় না, বিজ্ঞানের পরমাণুতত্ত্বেরও একটা দিক উদ্ঘাটিত হয়। ডালটন বলেছিলেন পরমাণুকে ভাঙা যায় না। এবং প্রতিটি পদার্থের শেষ অবস্থা হ'লো পরমাণু (এ মতবাদ এখন গ্রাহ্য নয়, কারণ পরমাণুকে ভাঙা সম্ভব হয়েছে)। পরমাণুবাদ থেকে জানতে পারা যায় যে প্রতিটি বস্তু অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত, আর এক টুকরো পাথরের ক্ষুদ্রতম অংশ যেমন পরমাণু, পর্বতের ক্ষুদ্রতম অংশও মূলত তা-ই। দু'য়ের পরমাণুর মধ্যে প্রভেদ নেই। পাথরকে গুঁড়ো ক'রে পাউডার করলেও একই অবস্থা। কাজেই ছোট কেউ নয়। হয়তো কোথাও অধিক সংখ্যক পরমাণুর সমারোহ, কোথাও বা তাদের আড্ডা কমজুরী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনে পরমাণুর যে পরিচয় জানতেন টমসন (১৮৯৮) বা রাদারফোর্ডের (১৯১০) পরমাণুতত্ত্ব তার থেকে পৃথক হলেও পদার্থের আদি উপকরণ যে পরমাণু তার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ঘটবার কোন ঘটনা ঘটেনি। বড়োর দিকে ভাবা যাক। নীহারিকাবাদের ভিত্তিতে গ্রহ-সৃষ্টিতত্ত্বের যে সব কথা বলা হয়েছে আজ হয়েল-নারলিকার, মার্টিনরাইল-গোল্ড-বণ্ডি-ম্যাক্‌ক্রিয়ার বিভিন্ন মতবাদ তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। তবে সমস্ত আকাশ-মহাসমুদ্রে অগণিত বিশ্ব এক একটা পুঞ্জীকৃত দ্বীপের মতো ভাসমান অবস্থায় আছে সে বিষয়ে সদম্ভে অস্বীকার করা চলে না। তা ছাড়া এই অনন্ত রহস্যময় বিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর সঙ্গে প্রতিটি প্রাণের আত্মীয়তা আছে এ কথা কল্পনাতেও যথেষ্ট রোমাঞ্চ আছে। এ যে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা বা বৈজ্ঞানিক সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনায় আমাদের এই পৃথিবীকে বর্তমান জীবনের আত্মীয় বলেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বলেন যুগ যুগ ধরে এই পৃথিবীর সঙ্গে

আমরা আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ এবং এই হেতু এ জীবনেও তার সঙ্গে যেন নিবিড় প্রীতিপূর্ণ বন্ধন অনুভব করি। এই সর্বানুভূতির কথা 'ছিন্নপত্রে'র বহু স্থানে প্রকটিত। এই গ্রন্থ সংকলন করবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্র-সুন্দরের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর কবির একটি পত্রের ('...সমুদ্র স্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম ...') অঙ্গচ্ছেদ করেন। তাঁর মনে হয়েছিল 'বিজ্ঞানের নগ্ন সত্য বর্ণনায় কবির ব্যক্তিত্ব যোগ' প্রশংসনীয় নয়। তার উত্তরে কবি তাঁকে যে পত্র লেখেন (ছিন্নপত্র, সংযোজন, ১৩১৮) তার মধ্যে কবির সর্বানুভূতি সংক্রান্ত বক্তব্য পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এই পত্রে কবি যে বক্তব্য রেখেছেন তা সকল যুগের সকল বৈজ্ঞানিকের প্রাণ মনের কথা।

কবি ও বিজ্ঞানীর পথ বিভিন্ন। এ সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সুন্দর আলোচনা করেছেন। আশ্চর্যের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সংঘাত লাগেনি। বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে আবর্তিত হয়ে তাঁর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য সে চেতনা বিজ্ঞানের রসে সিক্ত। তাই দেখা যায় বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বেদান্তের ভাষ্য তিনি মেনে নিতে পারেন নি নির্দ্বিধায়। বিস্মিত হতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনায় যে সত্যের আভাস পেয়েছেন, বিজ্ঞান তাকে নিশ্চিত প্রশ্রয় দিয়ে সুদৃঢ় করে তুলেছে। দিনরাত্রি, জন্মমৃত্যু প্রভৃতির যে সত্য তিনি তাঁর কল্পনায় সৃষ্টি করলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যেও পেলেন তারই প্রতিফলন, তারই প্রতিলিপি। বিজ্ঞানের দরবারে সমর্থন পেয়ে তাঁর কাল্পনিক জগত প্রসারিত হলো। ছোট ও বড়োর ঐক্য তিনি অনুভব করতে সক্ষম হলেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বত্র যে সব আবিষ্কার হয়েছে কবি সবকিছু সম্পর্কেই মোটামুটি খবর রাখতেন। স্কুল-কলেজে না পড়েও নিজের মনের তাগিদে তিনি বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বের সাগরে অবতরণ করে পান করেছেন তত্ত্বরস। ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের নানা রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, আর কবি বিস্মিত হয়েছেন, পুলকিত হয়েছেন। একাধারে অজস্র গীতি কবিতার সোনালী ফসল আর অপরদিকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা, এ দৃশ্য বিস্ময়কর।

বিজ্ঞানের বিচিত্র সম্ভার দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন, বিমুগ্ধ হয়েছেন। তার পরিচয় রেখে গেছেন অসংখ্য কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে।

বিজ্ঞান কল্পনার জগতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না একথা তাঁর কাছ থেকেই শুনতে পেলাম। বিজ্ঞানের পক্ষ সমর্থনে কবি বলেছেন, 'একদল পণ্ডিত বলেন যে, যতদিন অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকে ততদিন কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব সভ্যতার দিবসালোকে কবিতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা তাহাই মানিলাম। মনে কর কবিতা নিশাচর পক্ষী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে। ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানের আলো আর কি করে, কেবল 'makes the darkness visible', বিজ্ঞান প্রত্যহ অন্ধকার আবিষ্কার করিতেছে। অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস-সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্যপ্রিয়, কিন্তু এত বড় রহস্য কি আর কোন কালে ছিল! এখন একটা রহস্যের আবরণ খুঁজিতে গিয়া দশটা রহস্য বাহির হইয়া পড়িতেছে।' (কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন, ১৮৮১)

বিজ্ঞানের নানা শাখা থেকে কবি অসংখ্য উপমা সংগ্রহ করেছেন তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রকাশ করবার জন্য। 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধে কবি পদার্থ বিজ্ঞানের কথাই বলেছেন। 'বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটি পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী ভারাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক—একটু ক্ষুদ্র পালে নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবী বেষ্টনকারী বাতাস চাই··· বৃহত্ত্ব একটি উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ পশুপাখি কীটপতঙ্গ সকলেরই উপর তাহার অজস্র প্রকারের প্রভাব কার্য করে।'

'পল্লীগ্রামে' প্রবন্ধে কবি গ্রাম্য লোকেদের সরলতা, অতিথিপরায়ণতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে এরা যা জানে বা যা কিছু বিশ্বাস করে

তা নিতান্তই সহজ জ্ঞানে ও সহজ বিশ্বাসে করে। তাদের জ্ঞানের সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে, কাজের সঙ্গে এবং সর্বোপরি নিজেদের সঙ্গে একসূত্রের বাঁধন লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্য সাধনাই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য। বিষয়টিকে খোলসা করে বোঝাতে গিয়ে কবি একটি সুন্দর উপমা সংগ্রহ করেছেন জীববিজ্ঞান থেকে। '...নিম্নতম জীবশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিলেও তাহাদিগকে দুই-চারি অংশে বিভক্ত করিলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু জীবগণ যতই উন্নতিলাভ করিয়াছে, ততই তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে।' যে নিম্নজাতীয় জীবের কথা বলা হয়েছে তা খুব সম্ভবত 'হাইড্রা' নামে এক প্রাণীর কথা। 'জেনারেল জুওলজি' (Storer & Eusinger) গ্রন্থে 'হাইড্রা' সম্পর্কে আছে—
—'The ability of certain animals to restore or regenerate lost parts was first reported in 1744 by Trembley, an English naturalist, from studies on hydra. If a living specimen is cut across into two or more pieces, each will regenerate into a complete but smaller hydra.'

'আত্মীয়ের বেড়া' প্রবন্ধে কবি রসায়নশাস্ত্র থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন—'একলা একজন মাত্র লোক কিছুই নহে।...সে অমিশ্র জল-জনন বাষ্পের মত। যতক্ষণ জলজনন বাষ্প অমিশ্রভাবে থাকে, ততক্ষণ বায়ুর সঙ্গেও তাহার যে সম্পর্ক, জলের সঙ্গেও তাহার সেই সম্পর্ক।' এখানে 'জলজনন বাষ্প' বলতে কবি হাইড্রোজেন গ্যাসকে বুঝিয়েছেন। অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে এই গ্যাস তার 'জলজনন' নামের সার্থকতা প্রকাশ করে। তা নইলে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন গ্যাস একলা মানুষের কাজে তেমন লাগে না।

'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' প্রবন্ধে কবি বলেছেন সৌরজগৎ যেমন একটি বাষ্পচক্র ছিল, পরে তা থেকে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সে সময় এখনকার মত বৈচিত্র্য ছিল না। খণ্ড ও গীতিকাব্যও তেমনি। কবি লিখেছেন, 'প্রথমে সৌরজগৎ একটি বাষ্পচক্র ছিল মাত্র, পরে তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ-উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল। এখনকার মতন তখন

বৈচিত্র্য ছিল না। আমাদের এই বিচিত্রতাময় খণ্ড ও গীতিকাব্যসমূহের বীজ মাত্র সেই সৌর মহাকাব্যের মধ্যে ছিল।...সকলেরই মূল কারণ মাত্র ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন, অথচ আকর্ষণ সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্যতন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে।...সৌর জগতের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে পৃথক পৃথক হইয়া কাজের ভাগ না করিলে কোন মতেই চলে না। যদি আধুনিক বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়াও কিয়দ্দূর যাওয়া যায়, যদি এই একত্র সম্মিলিত বাষ্পরাশিগত অবস্থার পূর্বেও আর কোন অবস্থা থাকে এমন অনুমান করা যায়, তবে তাহা নানা স্বতন্ত্র আদিভূতসমূহের অস্ফুটভাবে পৃথকভাবে বিশৃঙ্খল সঞ্চরণ, পরস্পর সংঘর্ষ, যাহাকে ইংরেজিতে chaos বলিয়া থাকে। প্রথমে বিশৃঙ্খল পার্থক্য, পরে একত্র সম্মিলন ও তাহার পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচ্ছেদ। আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথমে কতকগুলো বিশৃঙ্খল পৃথক ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পরে প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা। কবিতাতেও এই নিয়ম খাটে।'

'মঙ্গলগীত' কবিতাতেও সমগ্র বিশ্বজীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

এত বড় এ ধরণী মহা সিন্ধু ঘেরা
দুলিতেছে আকাশ সাগরে—
দিন দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা ক'রে!
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি—
অরণ্য বহিছে ফুলফল
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি—
গণিতেছে প্রতিদণ্ড পল।

আর এক স্থানে একই কথা বলেছেন—সেই নক্ষত্র জগৎ, উল্কা, ধূমকেতু, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির কথা। '...এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পথচিহ্নহীন পথে অহর্নিশি হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এক নিমেষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব

করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।...এমন একটি পৃথিবী কেন—যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে, ঠিক এই মুহূর্তেই অনন্ত জগৎ প্রচণ্ড বেগে চলিতেছে এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে ; অতি বৃহৎ অতি গুরুভার লক্ষ কোটি অযুত নিযুত নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য তারা গ্রহ উপগ্রহ, উল্কা ধূমকেতু, লক্ষ যোজন ব্যাপ্ত নক্ষত্রবাষ্পরাশি কিছুই স্থির নাই ; অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনল-গোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে...প্রতি পলকেই কি অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে—তখন কল্পনা অনন্তের কোন্ প্রান্তে বিন্দু হইয়া যায়।' (কথাবার্তা ; সন্ধ্যাবেলায়, ১৮৮৪)

১৮৮৪ সালে 'ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বিজ্ঞান বলে, সূর্য-কিরণে অন্ধকার-রশ্মিই বিস্তর, আলোক-রশ্মি তাহার তুলনায় ঢের কম, একটুখানি আলোক অনেকটা অন্ধকারের মুখপাত্রস্বরূপ'-এর প্রায় বাহান্ন বছর পরে ১৯৩৭ সালে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে কবি পদার্থবিজ্ঞানের এই কথাটিকে প্রাঞ্জল করেছেন। কবির ভাষাতেই তা দেখা যাক্।

'এককালে মনে হয়েছিল অ-দেখারা রঙিন দলেরই পার্শ্বচর, অন্ধকারে পড়ে গেছে। যত এগোতে লাগল গুপ্ত আলোর সন্ধান, ততই সাতরঙা দলেরই আসন হল খাটো। বিজ্ঞানের জরীপে আলোর সীমানা আজ সাতরং-রাজার দেশ ছাড়িয়ে গেছে শতগুণ। লাল-উজানি আলোর দিকে ক্রমে আজ দেখা দিল যে ঢেউ সেই ঢেউ বেয়ে চলে আকাশবাণী, যাকে বলে রেডিওবার্তা, বেগনি-পারের দিকে প্রকাশ পেল বিখ্যাত র‍্যন্ট্‌গেন আলো যে আলোর সাহায্যে দেহের চামড়ার ঢাকা পেরিয়ে ভিতরকার হাড় দেখতে পাওয়া যায়।' 'পনেরো-আনা' প্রবন্ধে কবি একস্থানে বলেছেন, সাধারণ মানুষেরা যেন নিজেদের হেয় বলে মনে না করে। সাধারণ মানুষের সংখ্যাই অধিক, তারাই সংসারের গতি। মানুষের হৃদয় তাদের জীবনসত্ত্ব। তারা কোন কিছুই দখলে রাখে না, সব ফেলে চলে যায়। সংসারের সমস্ত কলগান তাদের দ্বারাই ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক তাদের পরেই যেন স্পন্দমান। তাঁরা যেন মনে না করেন যে তাঁদের জীবন ব্যর্থ। এই প্রসঙ্গে কবি বলছেন তাহলে প্রকৃতির অধিকাংশই তো ব্যর্থ। এবারে বিষয়টি পরিষ্কার করবার জন্য কবি বিজ্ঞানের উপমা নিলেন।

বললেন, 'সূর্যকিরণের বেশীর ভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্যন্ত টিকে। কিন্তু সে যাঁহার ধন তিনিই বুঝিবেন। সে ব্যয় অপব্যয় কি না বিশ্বকর্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না।' একই কথা ভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন—'সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে—সে যেন স্মরণ করে যে পৃথিবীর শুষ্ক ধূলিকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চির প্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে।'

মানুষকে দুই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সাধারণ মানুষ পনেরো আনা, তারা শান্ত। আর এক আনা মানুষ অশান্ত। এই এক-আনা মানুষের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি—'বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থির শান্ত নাইট্রোজেনই অনেক। যদি তাহার উল্টা হয় তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেমনি সংসারে যখন কোনো একদল পনেরো-আনা এক-আনার মতোই অশান্ত ও আবশ্যক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে, তখন জগতে আর কল্যাণ নাই...' 'ওজন' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটুকু রবীন্দ্রনাথ জানতেন। কেন্দ্রের দিকে ভারাকর্ষণ যখন বেশি হয় তখনই বস্তুর ভার বাড়ে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠলে ওজন কমে, চাঁদে গেলে আরও কমে, কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহে যদি পৃথিবীর কোন বস্তুকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তার ভার বেশি হয়। কারণ সেখানকার ভারাকর্ষণ পৃথিবীর থেকে বেশি। মানুষের স্বার্থ, অহংকার ইত্যাদির কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের এই তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ 'ভার বাড়ে কখন; না, কেন্দ্রের দিকে ভারাকর্ষণ যখন বেশি হয়। পৃথিবীতে যে হাল্কা জিনিস আমরা সহজেই তুলছি, যদি বৃহস্পতি গ্রহে যাই তবে সেখানে সেটুকুও আমাদের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কেন না সেখানে এই কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। আমরাও তাই দেখছি আমাদের নিজের কেন্দ্রের দিকের টানটা অত্যন্ত বেশি—আমাদের স্বার্থ ভিতরের দিকেই টানছে, অহংকার ভিতরের দিকেই টানছে, এইজন্যেই সব জিনিসই অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠছে—যা তুচ্ছ তা কেবলমাত্র আমার ওই ভিতরের টানের জোরেই আমাকে কেবলই চাপছে...'

গুড়, চিনি বা মধু যাই হোক না কেন, তার থেকে যখন অ্যালকোহল সৃষ্টি হয় তখন যে অঙ্গারাম্ল গ্যাস বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডেরও সৃষ্টি হয় তার খবরও কবি রাখতেন। সুগার থেকে হাইড্রোলিসিস পদ্ধতিতে (এনজাইম প্রয়োগে) গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। তার সঙ্গে 'ঈষ্ট' (Yeast) যোগ করলে গ্লুকোজ থেকে অ্যালকোহলের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে বেরিয়ে আসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। বদ্ধ পাত্রে কোন কারণে অ্যালকোহলের সৃষ্টি হলে (সেই পাত্রটির মুখ খোলা না থাকলে) পাত্রটি ফেটে যাবার সম্ভাবনা কারণ উদ্গত অঙ্গারাম্ল গ্যাস বেরোবার পথ খুঁজে নেবে। কবি এই তত্ত্বটিকে মানুষের রস-বিকৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন অতি সুন্দরভাবে। তিনি বলেছেন, 'চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে ম'দো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের প্রমত্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না, অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না,…'

Atmospheric Physics (বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত পদার্থ বিদ্যা) সম্বন্ধেও কবির ভাল ধারণা ছিল, অন্ততঃ তখনকার দিনে যতটা তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল কবি তার খোঁজ রাখতেন বলে মনে হয়। ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমণ্ডলের বেশ কয়েকটি স্তর আছে। সূর্যরশ্মি এই সব বায়ুস্তর ভেদ করে ধরাপৃষ্ঠে আসে। যদি তা না থাকত তাহলে সূর্য রশ্মির প্রচণ্ড তাপ আমরা সইতে পারতুম না। আমাদের গায়ে স্পর্শ দেবার আগে সূর্য কিরণ তার অনেক তাপ হারিয়ে এসেছে বায়ুমণ্ডলের নানা স্তরে। তারপরে এ আলো সহনীয়। বায়ুস্তর আছে বলেই সূর্যালোক সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, তা না হলে যে স্থানে আলো এসে পড়ত সেখানে সব কিছু পুড়ে ছাই হতো, আর তার পাশেকার কোন অংশে হয়ত বিরাজ করতো অতলান্ত শীতলতা। কবি অসতীর প্রেমের কথা বলার সময়ে এই তত্ত্বের উপমা নিয়েছেন। কবি বলেছেন, 'স্ত্রী দ্বারাই সতী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে নানাদিকে বিকীর্ণ করে দেয়—এইরূপে সে-প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না,

সকলকে আলোকিত করে। আমাদের পৃথিবীর এই রকমের একটি আবরণ আছে—সেটি বাতাসের আবরণ। এই আবরণটি দ্বারাই ধরণী সূর্যের আলোককে পরিমিত এবং ব্যাপকভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করে দেয়। এই আবরণটি না থাকলে রৌদ্র যেখানটিতে পড়ত সেখানটিকে দগ্ধ এবং রুদ্ররূপে উজ্জ্বল করত এবং ঠিক তার পাশেই যেখানে ছায়া সেখানে হিমশীতল মৃত্যু ও নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করত। অসতীর যে প্রেমে শ্রী নেই, সংযম নেই, সে প্রেম নিজেকে পরিমিতভাবে সর্বত্র বিকিরণ করতে পারে না, সে প্রেম এক জায়গায় উগ্র জ্বালা এবং ঠিক তার পাশেই তেজোহীন আলোকবঞ্চিত ঔদাসীন্য বিস্তার করে।'[১৩]

'এপার ওপার' প্রবন্ধে কবি একস্থানে প্রশ্ন তুলেছেন আমরা যে চলি, আমাদের কে চালায়! ঐ চালকের সন্ধানে বেরোলে উৎসবস্তুর হদিশ পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। কবি বলেন যিনি 'পরমাগতি' তিনিই গতি দিচ্ছেন। এখানে একটি কথা বলবার আছে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পূর্বে বিজ্ঞানীরা ছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাশীল। নিউটন তো স্বীকার করেছেনই, এমন কি পরবর্তীকালে সার জেমস্ জীনস্ পর্যন্ত 'Vital force' এর কথা বলেছেন।...এই 'Vital force' কি? কোথেকে আসে? আধুনিক বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত তার সঠিক জবাব দিতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে কবির মনে এল পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির কথা। পৃথিবীকে আবার সূর্য আকর্ষণ করছে তার কথা। কবির কথায়, 'আমরা হয়তো মনে করতে পারি পৃথিবী যে আমাকে টানছে সেটা পৃথিবীরই টান, কিন্তু তাই যদি হয়, পৃথিবীকে টানে কে? সূর্যকে কে আকর্ষণ করছে? এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহতারানক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না, সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্যেরও গতি।'[১৪]

'লিপিকা' (১৩২৯) গ্রন্থের 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' নিবন্ধে আছে 'এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

১৩ বিকার শংকা, শান্তিনিকেতন
১৪ এপার ওপার, শান্তিনিকেতন

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ; কোনখানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।'

'প্রাণমন' (লিপিকা) প্রবন্ধে সোনারতরী যুগের সর্বানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। বটগাছকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'আমি তোমারই খেলার সাথী, লক্ষ হাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডূষে গণ্ডূষে তোমারই মতো সূর্যালোক পান করেছি। ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।'

'শেষরক্ষা' নাটকে কবির স্নেহ অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে মেডিক্যাল ষ্টুডেন্ট গদাইচন্দ্রের 'পরে।

চন্দ্রকান্ত। এই যে, গদাই। শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে। তোমার বাবা জানলে যে শিউরে উঠবেন।

গদাই। না ভাই, প্যাথলজি ষ্টাডি করবার পক্ষে তোদের সংসর্গ টা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদের হৃদয়টা যে সর্বদাই আইঢাই করছে, সেটা অজীর্ণ রোগের একটি নামান্তর তা জানিস ?…জানলার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাও, যা চাও সেটি যে বাই-কার্বোনেট অফ্ সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

চন্দ্রকান্ত। হৃদয়যন্ত্রটির বাসা পাকযন্ত্রের ঠিক উপরেই, এ কথা কবিরা মানে না, কিন্তু কবিরাজরা মানে।

বিজ্ঞানের উপমা গ্রহণ করার এরকম দৃষ্টান্ত আরো আছে। 'হাস্য-কৌতুক' বইতে বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে কঠিন ব্যঙ্গের আঘাত আছে। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানকে উড়িয়ে দেবার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধিতা বর্তমান, তা রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখালেন।

'আর্য ও অনার্য' নাটিকা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

চিন্তামণি। য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ—আমি প্রমাণ করে দেব। এখনো আর্যবংশীয়েরা তেল মাখবার পূর্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ করে ভূমিতে তিনবার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন ?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আপনি ?
অদ্বৈত। না।
চিন্তামণি। আপনি জানেন ?
প্রথম লেখক। না।
চিন্তামণি। না যদি জানেন তবে আপনারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা কইতে যান কেন? হাই তোলবার সময় আর্যরা তুড়ি দেন কেন আপনারা কেউ জানেন ?
সকলে। (সমস্বরে) আজ্ঞে, আমরা কেউ জানিনে।
চিন্তামণি। তবে? এই যে আমাদের আর্য মেয়েরা বাতাস করতে করতে পাখা গায়ে লাগলে ভূমিতে একবার ঠেকায়, তার কারণ আপনারা কিছু জানেন ?
সকলে। কিছু না।
চিন্তামণি। এই দেখুন দেখি! এই সকল বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা না করেই অনুসন্ধান না করেই, আপনারা বলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ? অথচ আর্য হাঁচে কেন, হাই তোলে কেন, তেল মাখে কেন, এ আপনারা কিছুই জানেন না।
হরিহর। আচ্ছা মশায়, আপনিই বলুন। তেল মাখবার পূর্বে ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণ কী ?
চিন্তামণি। ম্যাগনেটিজম। আর কিছু নয়। ইংরাজিতে যাকে বলে ম্যাগনেটিজম্।
হরিহর। (সবিস্ময়ে) আপনি ম্যাগনেটিজম সম্বন্ধে ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্র কিছু পড়েছেন ?
চিন্তামণি। কিছু না। দরকার নেই। বিজ্ঞানশিক্ষা কিম্বা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরেজী পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কী বলেন? প্রাণশক্তি, কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক কারণশক্তির উত্তেজনা হয়— এই তো ম্যাগনেটিজম।
এমনিভাবে হাজার রকম ব্যাপারকে চিন্তামণি বিশুদ্ধ ম্যাগনেটিজম

বলে চালিয়ে গেল অথচ তার সম্বন্ধে কোন ধারণা তার নেই। তার বক্তব্য হচ্ছে ম্যাগনেটিজম এমন কি অক্সিজেনও আমাদের আবিষ্কার।

এবারে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরবো।

(১) প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ী কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জানতে পারে না— অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড়ো নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে। এই বুঝি মেয়েদেরই স্বভাব······ (বিমলার আত্মকথা)

অপারেশন করবার সময়ে অ্যানেস্থেসিয়ার কথা স্মর্তব্য। ইথার, ক্লোরোফর্ম, নাইট্রাস অক্সাইড, পেন্টোথাল সোডিয়ম প্রভৃতি দ্রব্য প্রয়োগে সমস্ত দেহ অথবা কোন অঙ্গকে অচৈতন্য করা যায়।

(২) পৃথিবী চাঁদের মতো মরা জিনিস নয়, সে নিশ্বাস ফেলছে, তার সমস্ত নদী সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠছে—সেই বাষ্পে সে ঘেরা। তার চতুর্দ্দিকে ধুলো উড়ছে, সেই ধুলোর ওড়নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শক এই পৃথিবীকে দেখবে, এই বাষ্প আর ধুলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এর দেশ-মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে?

এই পৃথিবীর মতো যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলই আইডিয়ার নিশ্বাস উঠছে, এই জন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট; যেখানে তার ভিতরের জলস্থল, যেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না। মনে হয়, সে যেন আলোছায়ার একটা মণ্ডল। আমার বোধ হচ্ছে, যেন সজীব গ্রহের মতো আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁকছি।

(সন্দীপের আত্মকথা)

'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থে 'প্রত্নতত্ত্ব' রচনার উপশিরোনাম হচ্ছে, 'প্রাচীন ভারতে গ্যালভানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কি নাম

ছিল।' এর মীমাংসাও 'আর্য ও অনার্য' নাটিকার ম্যাগনেটিজমের মতই হয়েছে। মীমাংসা করেছেন 'মধুসূদন শাস্ত্রী'। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন কীটে এবং আক্রমণকারী মুসলমানেরা সমস্ত মূল্যবান দলিল ধ্বংস করে ফেলেছে কাজেই সে প্রমাণ নেই, নইলে সেসব কোথায় যাবে। আরো এক যুক্তি—আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একশ মুনিঋষির নাম আছে, তারমধ্যে গল্বন মুনির নাম কেন নেই? বোধহয় 'গল্বন' থেকে গ্যালভানিক ব্যাটারি সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন ভারতে সমস্ত কিছুই ছিল। বিজ্ঞানের যাবতীয় সৃষ্টি এদেশেই—পরে ওদেশের বিজ্ঞানীরা প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের তথ্য সামগ্রী নিয়ে এখন নিজেদের নামে প্রচার করেছেন এরকম একটা মিথ্যে ধারণা আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও প্রচারিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের আঘাতে তাদের শায়েস্তা করতে চেয়েছেন। গ্যালভানিক ব্যাটারি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য এই যে ভোল্টা যে তড়িৎ-জনন কোষ তৈরী করেছিলেন গ্যালভানির প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ ঐ কোষকে 'ভোলটেইক সেল' বা ব্যাটারিকে 'গ্যালভানিক ব্যাটারি' বলা হয়ে থাকে।

'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থে 'গুরুবাক্য' নামে একটি সুন্দর ব্যঙ্গ আছে। ধাপ্পাতে আধুনিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত ছেলেরাও সমস্ত যুক্তিতর্ক হারিয়ে যে গুরুর কাছে নতি স্বীকার করে তার সুন্দর বর্ণনা আছে। গুরু শিরোমণির এক শিষ্যের মনে হঠাৎ চিন্তার উদ্রেক হলো—রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু পাখী মারা গেল কেন? তার জবাবে বিজ্ঞানের ছাত্র খগেন্দ্র বললো অস্ত্রাঘাত এর কারণ। শিরোমণি বললেন—

'বটে! হাঃ হাঃ হাঃ, আধুনিক নব্যতন্ত্র কালেজের ছেলেদের মতোই উত্তর হয়েছে। শাস্ত্র চর্চা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়ার ফলই এই। প্রশ্ন হল, জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, উত্তর হল, অস্ত্রাঘাতে। এ কেমন হল জান? কাশীধামে বৃষ্টি হল আর খড়দহে পঙ্গপালে ধান খেলে। হাঃ হাঃ হাঃ।'

তারপরে শিরোমণি খগেন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন অস্ত্রের আঘাতেই জটায়ুর মরণ হলো কেন, রক্তপিত্তে হ'লো না কেন! এ ছাড়া আরো প্রশ্ন—যুদ্ধটা রাবণের সঙ্গে হ'লো কেন, কেনই বা ভস্মলোচনের সঙ্গে হয় নি? রাবণের মৃত্যু না হয়ে জটায়ুর মৃত্যু হ'লো কেন?

শিরোমণির শিষ্যরা এবার খগেন্দ্রকে কোণঠাসা করলো।

কী হে খগেন্দ্র, একটা জবাব দাও-না। তোমাদের রস্কো সাহেব কী লেখেন? আর একজনের প্রশ্ন—

'তোমাদের টিণ্ডালই বা কী বলেন—রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন? আরও একজন শিষ্য গুরুকে অনুসরণ করলো—

'রক্তপিত্তে না মরে অস্ত্রাঘাতে মরবার জন্যেই বা তার এত মাথাব্যথা কেন? হক্সলি সাহেব কী মীমাংসা করেন শুনি!'

খগেন্দ্র পরাভূত, বিস্মিত এবং নির্বাক। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এখানে সে যুগের তিনজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম আছে। যারা এঁদের নাম করলো বলা বাহুল্য তারা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী নয়। সেকালে বিজ্ঞান শিক্ষিতের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হতো।

তিনজন বিজ্ঞানী হলেন—জুলিয়ান হাক্সলির পিতা টমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫-৯৫) ইনি বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্। জন টিণ্ড্যাল (১৮২০-৯৩) বিখ্যাত পদার্থবিদ্। সার হেনরি এনফিল্ড রস্কো (১৮৩৩-১৯১৫) ইংরেজ রসায়নবিদ্।

বিজ্ঞানের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ব্যঙ্গ রচনাসমূহের মধ্যেও সর্বত্র ফুটে উঠেছে। যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন আজীবন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধার ফলশ্রুতি বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ। অনেক আগে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানের প্রতি এদেশের লোকের আকর্ষণ কম বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'...বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেমনই কাল, তেমনই পাত্র! এখানে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন নামক একটা কল জুড়িয়া দিলেই যে বিজ্ঞান একদমে বাঁশি বাজাইয়া রেলগাড়ির মতো ছুটিতে থাকিবে অত্যন্ত অন্ধ অনুরাগও এরূপ দুরাশা পোষণ করিতে পারে না।...বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।...যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলা

দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে—' (শিক্ষা, প্রসঙ্গ কথা)

'শেষের কবিতা' গ্রন্থ থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা যাক্। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক পরে ১৯২৯ সালে রচিত শেষের কবিতা গ্রন্থে তার অনেক প্রভাব আছে।

নাম সম্পর্কে আলোচনার সময়ে অমিত লাবণ্যকে বলছে, 'আপনি যে কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relativity of Names প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির করেছি।'

'বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।'

দেশ ও কাল তত্ত্বও কবির অজ্ঞাত নয়। তার প্রমাণঃ 'সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি ব'লে কোনো পদার্থ নেই, ট্যাঁক ঘড়ি আছে, ট্যাঁক অনুসারে তার চাল। আইন্‌স্টাইনের এই মত।'

সূর্যের চারপাশে তার নিজস্ব এলাকায় প্রচণ্ড আগুনের হলকা। অগ্নি ঝটিকা বয়ে চলেঃ কবি তা জানেন। 'ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না, সূর্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়।'

'মাসিমা আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।'

একথা সম্পূর্ণ পদার্থবিদ্যার। কোন বস্তুকে যদি জলে বা কোন তরলে রাখা হয়, তাহলে ঐ বস্তু (কঠিন হলে) তার আয়তনের অনুযায়ী তরল অপসারিত করে। যদি অপসারিত তরলের ওজন বস্তুটির চেয়ে বেশী হয় তাহলে সেই বস্তুটি ভাসে। তার মানে এই নয় যে বস্তুটির ওজন কমে গেছে। যেমন জাহাজ জলে ভাসে।

গ্রহকুলের সৃষ্টির কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। দুটি নক্ষত্র বিশাল শূন্যে কখনোই পরস্পরের মুখোমুখি হয় না। হঠাৎ যখন সেই দুর্দৈব ঘটলো তখন হলো বিষম গণ্ডগোল। তারই ফলশ্রুতিতে গ্রহের সৃষ্টি। এই তত্ত্বটিকে কবি অমিতের কণ্ঠে অপূর্বভাবে প্রয়োগ করেছেন।

'বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্মের মিল হয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সেই আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম।'

অক্সিজেনের বিভিন্ন ব্যবহার কবির অজানা নয়।

'অমিত বললে, 'অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর-এক ভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না।'

'সে' গ্রন্থে রসায়ন থেকে সংগৃহীত উপমা তুলে ধরছি।

'তোমার এখানে চাকরে মনিবে বেমালুম মিশিয়ে গিয়ে একটা যৌগিক পদার্থ খাড়া হয়েছে বুঝি ?

মাষ্টার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দাহ্য মেজাজ ঘুচে গিয়ে দোঁহে মিলে একেবারে জল।'[১৫]

১৯৩৪ সালের ১৬ই জুলাই ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় কবি সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে উদ্ভিদতত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'উদ্ভিদের দুই শ্রেণী—ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায় ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্ররূপে আকৃতিবান, শাখায়িত তার বিস্তার।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হোতে হোতে তা লুপ্ত হয়ে যায়। ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশু প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হোতে হোতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল তমালেরই মতো ; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ বিচিত্র ফুলে ফুলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে ভাবের এবং রূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম

১৫ সে : রবীন্দ্রনাথ (১৩শ অধ্যায়)

গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। এ'কেই আমরা বলে থাকি সাহিত্য।'[১৬]

প্রায় প্রতি দেশেই মাঝে মাঝে কোন কোন যুগ এমন হঠাৎ এসে পড়ে যখন দেশে উত্তেজনা থাকে প্রচণ্ড হয়ে। দেশের মধ্যে প্রবাহিত সেই উত্তেজনার প্রচণ্ড তরঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রকেও আপ্লুত করে ফেলে তার প্রকৃতিকে করে অভিভূত। যুদ্ধকালীন সময়ে য়ুরোপে যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। একথা সত্য যে ঐ ভাব চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের দেশেও দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরবর্তী কালে বিস্তর গল্প, উপন্যাস লেখা হলো সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে আশ্রয় ক'রে। আজ ইংলণ্ডের বা ইউরোপের সাহিত্যের মতোই এখানেও সেই উত্তেজনার জোয়ার। উপমার সাহায্যে তিনি লিখেছেন, 'ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগের পরে যখন চরিত্র শৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্য সূর্য তারি কলঙ্করেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাকলেও প্রতি মুহূর্তে সূর্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্যের সত্তায় তার অবস্থিতি সত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্ছে আলোতে।'[১৭]

সাহিত্যবিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কিনা এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন যে প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে কোন্ জিনিস সংগ্রহ করবার জন্যে এই বিশ্লেষণী পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যে সাহিত্য আলোচিত হতে চলেছে তার উপাদানগুলিই কি বেছে নেবার জন্যে এই প্রচেষ্টা? তাই যদি হয় তবে তার প্রয়োজন নেই। যেহেতু উপাদানসমূহকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। তিনি বলেন যে 'সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে।' বিষয়টিকে ভালো ক'রে বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন—'প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে

১৬ সাহিত্যের তাৎপর্য্য : প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪১
১৭ সাহিত্য ধর্ম : বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪

বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয় কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরাপড়া সত্ত্বেও জোর করে বলতে হবে যে সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেন না উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী…'[১৮]

অনেকের মনে একটা ধারণা দানা বেঁধে আছে যে সাহিত্যে কেবলমাত্র একটি সত্য বর্তমান তা হলো প্রকাশের সত্য অর্থাৎ যা বলতে চাই তা প্রকাশ করবার পন্থাগুলো যদি অযথা হয় তাহলেই তাকে বলা হ'লো মিথ্যে আর যথাযথ হলেই তাকে বলা হ'লো খাঁটি। একথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যের আদি সত্য হচ্ছে তার প্রকাশ। কিভাবে তাকে প্রকাশ করা হ'লো সেইটেই মূল কথা। কিন্তু তা-ই কি শেষ কথা? এর মীমাংসা করতে গিয়ে কবি জীববিজ্ঞানের তত্ত্বের দোহাই টেনেছেন। বলেছেন, 'জীবরাজ্যের প্রথম সত্য হচ্চে প্রটোপ্ল্যাজম, কিন্তু শেষ সত্য মানুষ। প্রটোপ্ল্যাজম্ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু মানুষ প্রটোপ্ল্যাজমের মধ্যে নেই। এখন এক হিসাবে প্রটোপ্ল্যাজমকে জীবের আদর্শ বলা যেতে পারে, এক হিসাবে মানুষকে জীবের আদর্শ বলা যায়। সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম সত্য হচ্চে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ।'[১৯] এটি লোকেন পালিতকে লেখা একটি পত্র থেকে তুলে দেওয়া হ'লো।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সমাজ,) প্রবন্ধে কবি পদার্থ বিদ্যা থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন। 'স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি; সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে পরিমাণে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিচ্ছে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে পরিমাণে আকর্ষণ ক'রে আনতে পারছে না।'

'সাহিত্য' (১৩১৪) গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা প্রয়োজন।

(১) সূর্যের ভিতরের দিকে বস্তুপিণ্ড আপনাকে তরল-কঠিন নানাভাবে

১৮ সাহিত্য বিচার: প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩৬

১৯ লোকেন পালিতকে পত্র: সাধনা, ১২৯৯

গড়িতেছে, সে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়া আলোকের মণ্ডল সেই সূর্যকে কেবলই বিশ্বের কাছে ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। এইখানেই সে আপনাকে কেবলই দান করিতেছে, সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতেছে। মানুষকে যদি আমরা সমগ্রভাবে এমনি করিয়া দৃষ্টির বিষয় করিতে পারিতাম তবে তাহাকে এইরূপ সূর্যের মতোই দেখিতাম। দেখিতাম, তাহার বস্তুপিণ্ড ভিতরে ভিতরে ধীরে ধীরে নানা স্তরে বিন্যস্ত হইয়া উঠিতেছে আর তাহাকে ঘিরিয়া একটি প্রকাশের জ্যোতির্মণ্ডলী নিয়তই আপনাকে চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে। সাহিত্যকে মানুষের চারিদিকে সেই ভাষারচিত প্রকাশমণ্ডলী রূপে একবার দেখো। এখানে জ্যোতির ঝড় বহিতেছে, জ্যোতির উৎস উঠিতেছে, জ্যোতির্বাষ্পের সংঘাত ঘটিতেছে।—বিশ্বসাহিত্য

(২) বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান কাজ, সূর্যালোককে ভাঙিয়া বন্টন করিয়া চারিদিকে যথাসম্ভব সমানভাবে বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া। বাতাস না থাকিলে মধ্যাহ্নকালেও কোথাও বা প্রখর আলোক কোথাও বা নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করিত।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মনোরাজ্যের চারিদিকেও সেইরূপ একটা বায়ুমণ্ডলের আবশ্যকতা আছে। সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া এমন একটা অনুশীলনের হাওয়া বহা চাই যাহাতে জ্ঞান এবং ভাবের রশ্মি চতুর্দিকে প্রতিফলিত বিকীর্ণ হইতে পারে—বাংলা জাতীয় সাহিত্য।

(৩) পাওয়া না পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়া ছাড়া, পাওয়া যাইতেই পারে না; দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ছাড়া বিকাশ হইতেই পারে না—সৃষ্টির গোড়াকার এই নিয়ম। একের দুই হওয়া এবং দুয়ের এক হইতে থাকাই বিকাশ।

বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখো। মানুষের একদিন এমন অবস্থা ছিল যখন সে গাছে পাথরে মানুষে মেঘে চন্দ্রে সূর্যে নদীতে পর্বতে প্রাণী-অপ্রাণীর ভেদ দেখিতে পাইত না। তখন সবই তাহার কাছে যেন সমান ধর্মাবলম্বী ছিল। ক্রমে তাহার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে অভেদ হইতে প্রথমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। তাহা যদি না হইত, তবে প্রাণের প্রকৃত লক্ষণগুলিকে সে কোনদিন

জানিতেই পারিত না। এ দিকে প্রথমে প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝখানের গণ্ডিটা ঝাপসা হইয়া আসিল; কোথায় উদ্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ তাহা আর ঠাহর করা যায় না। তাহার পরে আজ ধাতুদ্রব্য, যাহাকে জড় বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি, তাহার মধ্যেও প্রাণের লক্ষণ বিজ্ঞানের চক্ষে ধরা দিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব যে ভেদবুদ্ধির সাহায্যে আমরা প্রাণ জিনিসটাকে চিনিয়াছি, চেনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভেদটা ক্রমেই লুপ্ত হইতে থাকিবে, অভেদ হইতে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব হইতেই ঐক্য বাহির হইবে এবং অবশেষে বিজ্ঞান একদিন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে সমান সুরে বলিবে : সর্বং প্রাণং এজতি। সমস্তই প্রাণে কম্পিত হইতেছে।

—সৌন্দর্য ও সাহিত্য

প্রথমটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের; দ্বিতীয়টি Atmospheric physics-এর এবং তৃতীয়টি আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে।

বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি জানতে তাঁর যে অসীম উৎসাহ ছিল সে বিষয়ে ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী 'কবি সার্বভৌম' গ্রন্থে লিখেছেন, '...আর একদিন দেখি Architecture of the universe নামে অতি আধুনিক বিজ্ঞানের বই পড়িতেছেন; অন্যদিন দেখি Eskimoদের সম্বন্ধে নতুন একখানি গ্রন্থ অভিনিবেশ সহকারে পাঠে রত। কবি যে কত রকমের বই পড়িতেন তাহার সংবাদ বাহিরের লোকের জানা নাই এবং জানাও সম্ভব নহে।'

বাংলা সাহিত্যে কেবল মাত্র নয়, ভারতীয় সাহিত্যেও খুব সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ-ই একমাত্র শিল্পী যাঁর মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত এবং যিনি কাল্পনিক সংগতিকে উপেক্ষা করে 'অসংগতির সৌন্দর্যকে' উপলব্ধি করেছেন যথার্থভাবে। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন, '......এই বিশ্ব রচনায় বিস্ময়করতা আছে...তার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে নি আমার মনে কোন পৌরাণিক বিশ্বাস, কোন বিশেষ পার্বনবিধি। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরে স্থান দিতে চেয়েছি।'

নিজের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্যে কবি বারবার বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন। এ পারা বড়ো শক্ত পারা। বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে না পারলে এর প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত অপ-প্রয়োগের কালিমা মাখে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সার্থক পথিকৃৎ।

কর্মজীবনে বিজ্ঞান

কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করেই কবি তৃপ্ত হন নি, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক প্রয়াসের বন্দোবস্ত তিনি করেছিলেন। সুইডিস মহিলা মিস্ জিয়ানসন শান্তিনিকেতনে এক বৎসর সুইডিস পদ্ধতিতে বয়ন-শিল্প শিক্ষা দিয়ে দেশে ফিরে যাবার পর মিস সেডারব্লম স্লয়ড শিক্ষিকা রূপে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। এঁর শিক্ষাদানের ফলেই শ্রীনিকেতনে বয়ন বিভাগ গড়ে ওঠে।

বিনয়-ভবনের (শিক্ষণ কলেজ) কারু অধ্যাপক লক্ষীশ্বর সিংহ শ্রীনিকেতনে কাঠের কাজের প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের আদেশে এ কাজ হয়েছিল তা বলা বাহুল্য। এই সময়ে তিনি 'কাঠের কাজ' নামে একখানা বই লেখেন। বাংলা ভাষায় হাতে কলমে কাঠের কাজ শেখাবার ও শিক্ষা করবার বই খুব সম্ভবত এই প্রথম। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকাতে লেখেন, 'আমাদের মতে পঙ্গুতাই ভদ্র সমাজের লক্ষণ, হাত পা গুলোকে অপটু করিয়া তুলিলেই ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি যতদিন বুঝিতে পারি নাই ততদিন বাঙালী ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল কেরানীতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখা গেল তাহার মত অসহায় প্রাণী আর জীবলোকে নাই। সংসার সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সংকটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ গ্রামের সমস্যা নিয়েও অনেক চিন্তা করেছেন। জমিদার হিসেবে কেবলমাত্র টাকা আদায় করাটাকেই সর্বস্ব জ্ঞান করেন নি তার প্রমাণ বহু মেলে। সমাজ সংস্কারকেরা গ্রামের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে যেমন ভেবেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি নানা সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কংগ্রেসের গ্রাম উদ্যোগ পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে কবির মনে বাংলা দেশের গ্রামের নানাবিধ সমস্যার কথা উদয় হয়েছে। প্রথমেই কুটির শিল্পের কথা তিনি ভেবেছেন। বাংলা দেশের বুনিয়াদি শিল্প হচ্ছে—ধান থেকে চাউল তৈরী। সেই শিল্প মৃত্যুমুখী। নারী সমাজের অধিকাংশের উপজীবিকা ছিল ধান ভানা। এই শিল্পের অপমৃত্যুর জন্য সেই কর্মী সমাজ কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছে। যে শিল্প ছিল গ্রামের সর্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত তা ক্রমশই শহরের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে পড়লো। কবি আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন যে এই শিল্পকে কেন্দ্র করে সমাজে ধনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। ১৯৩৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কবি লিখলেন, 'when a people's diet takes a vicious path of its own impoverishment, it causes a graver mischief than any act of cruelty inflicted by an alien power. Rice mills are menacingly spreading fast extending throughout the province on unholy alliance with malaria and other flag-bearers of death robbing the whole people of its vitality thro a constant weakening of its nourishment......' (V. B. News, 1936. Jan. P51)

১৩২৬ সালের শান্তিনিকেতন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'আহারের অভ্যাস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯১৯ সালে তিনি খাদ্যসমস্যা নিয়ে এক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। ঐ পত্রিকায় 'খাদ্য চাই' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে। তাতে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রস্তুত করবায় উপদেশ আছে।

খাদ্য সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গাতে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। বাঙালীরা ভাতের ফেন ফেলে দেয় এই নিয়ে অনেক কথা তিনি বলেন। বাঙালীর রান্নাঘরের অসুবিধে সম্বন্ধেও তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'রান্নাঘরে চুলার যে সাবেক ব্যবস্থা আছে সকলেই জানেন তাহাতে যেমন দুঃখ বেশী তেমনি ব্যয়ও বেশী এবং তাহাতে রান্নাঘর যথোচিত পরিষ্কার রাখা দুঃসাধ্য। আধুনিক প্রণালীতে চুলা নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়তাবশত পাচকদের তাহা ভালো লাগে নাই। তাহারা নানা ছুতা করিয়া সেই

চুলা বর্জন করিল। ইহাতে রান্নাঘরের দুঃখ তাপ পূর্ববৎ প্রবল হইয়া উঠিল আমরাও ইহা সহিয়া গেলাম; নূতন প্রণালীর দায় কেহ গ্রহণ করিলাম না, নূতন করিয়া চিন্তা করিলাম না।' (উদ্যোগ শিক্ষা: শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক)

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মিসেস মার্গারেট স্যাংগার কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে হাজারো প্রশ্ন দেখা দেয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মহিলা চিকিৎসক মেরি ষ্টোপস্, আমেরিকার মিসেস মার্গারেট স্যাংগার এই সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেন। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের আমন্ত্রণে মিসেস স্যাংগার ভারতে এসে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধিজী জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই সম্পর্কে মিসেস স্যাংগারের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে পত্র দেন তা Birth Control Reviewতে প্রকাশিত হয়। কবির পত্রের মর্ম সম্পূর্ণ আধুনিক। বহুদিন পূর্বে তিনি যা বলেছিলেন আজ সেই মত যথার্থ সম্মান লাভ করছে। পত্রখানি বিদেশী ভাষায় লিখিত। তার কিয়দংশ তুলে ধরছি। 'I am of opinion that Birth Control movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause of peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its own rightful limits. In a hunger stricken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children into existence than could properly be taken care of, causing endless suffering to them and imposing a degrading condition upon the whole family. It is evident that the utter helplessness of a growing poverty very rarely acts as a check controlling the burden of over-population. It proves that in this case nature's urging gets better of the severe warning that

comes from the providence of civilised social life. Therefore, I believe, that to wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generations of children to suffer privations and untimely death for no fault of their own, is a great social injustice which should not be tolerated. I feel grateful for the cause you have made your own and for which you have suffered...'

কৃষি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক লরেন্স সাহেব রেশম গুঁটিপোকার চাষ নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের তাতে প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। জগদীশচন্দ্র বসুকে এক পত্রে (২৪।৬।১৮৯৯) কবি তাঁর চাষবাসের সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমার চাষ-বাসের কাজ মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম, তাহার গাছগুলা দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না।'[২০]

১৯৪০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'পল্লীসেবা' সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে কবি বলেন, 'অশিক্ষিত পল্লীবাসীর সঙ্গে শিক্ষিত শহরবাসীর ভেদ দূর না করতে পারলে দেশ কখনো বড়ো হতে পারবে না। আজ বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। সব শিক্ষার পথকে সহজ করে গ্রামে সর্বজনের সুগম করে দিতে পারাটাই সকলের চেয়ে বড়ো সেবা। যে শিক্ষা য়ুরোপ থেকে এসেছে আমাদের দেশে তাকে গ্রহণ ক'রে সকলের মাঝে ঢেলে দিতে হবে, কারণ শিক্ষার মধ্যে দেশ বিদেশের ভেদ নেই।'[২১]

প্রমথনাথ সেনগুপ্তের লেখা 'পৃথ্বীপরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকাতে কবি বলেছেন যে বিজ্ঞানকে সহজে আয়ত্বাধীন করা যায় না বলেই বোধহয় শিক্ষকেরা নানা দুরূহ শব্দ বিন্যাসের দ্বারা বিজ্ঞান বুঝিয়ে থাকেন। তার ফলে

২০ চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড।
২১ প্রবাসী, ১৩৪৬, ফাল্গুন, পৃঃ ৬৬২-৬৩।

শিক্ষার্থীদের মন ঐ দুঃসহ ভারে পীড়িত হতে থাকে এবং তাকে আয়ত্ব করতে গিয়ে প্রভূত শক্তির অপব্যয় ঘটে। কবি এই মানসিক পীড়নকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করতেন। আমাদের দেশে সর্বজনকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলবার কোন প্রয়াস নেই দেখে কবি দুঃখিত। কবি বলেছেন, 'জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটনের চেষ্টা পাশ্চাত্য দেশে আজকাল বহুপ্রচলিত। এই কর্তব্যসাধনে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁরা কেবল যে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ তা নয়, তাঁরা ভাষা ব্যবহারে নিপুণ। তাঁরা শিক্ষণীয় বিষয়কে যথোচিত সরল করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। আমাদের দেশে জনসাধারণ যেখানে বিজ্ঞানের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত সেখানে সহজ প্রণালীতে বিদ্যাদানের অধ্যবসায়কে আমি পুণ্যকর্ম বলে গণ্য করি।' এই প্রসঙ্গে কবির সৃষ্ট লোকশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থমালার কথা স্মরণীয়।

গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে কবির আগ্রহ বরাবর ছিল। 'পল্লীসমিতি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন সাংবাদিক ৺হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর 'কংগ্রেস' গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেছিলেন। তার তিন নম্বর অনুচ্ছেদে আছে, 'স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব্য প্রবল এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।'

পঞ্চম অনুচ্ছেদ—'বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষা দান,'

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ—'প্রতি পল্লীতে একটি করিয়া চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় স্থাপন করা'

অষ্টম অনুচ্ছেদ—'আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্যে বা গো-মহিষাদির পাল দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা।'

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ—পল্লীর তত্ত্ব সংগ্রহ: অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, অধিবাসীদের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসায় উন্নতি, অবনতি, বিদ্যালয় ও পাঠশালা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া

(জ্বর), ওলাউঠা, বসন্ত ও অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীপুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিক-রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।'

পল্লী সমিতির খসড়া রচনায় কবির বৈজ্ঞানিক মন যেভাবে ক্রিয়া করেছে তা সহজেই অনুমেয়। আজকাল ভারত সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত বনমহোৎস-সবের অনুষ্ঠান আমরা দেখে থাকি। এখন এদেশে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এর ব্যবহারিক দিকটা উপেক্ষিত ছিল। রবীন্দ্রনাথই বোধহয় এদেশে প্রথম যিনি এর আবশ্যকীয়তা অনুভব করেছিলেন। একবার বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে শ্রীনিকেতনে এক ভাষণে কবি বলেন মানুষ অরণ্য সম্পদকে ক্রমেই ধ্বংস ক'রে পৃথিবীর সর্বনাশ সাধন করছে। ১৩৪৫ সালের কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে কবি 'অরণ্য দেবতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, 'এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্য সম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা দাঁড়িয়েছে।... মানুষ অমিতচারী...মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে রক্ষা করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে তার কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ করেছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরের ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না ; এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তার ছায়া।'

কবি কেবল উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মারফৎ বহু গাছ গ্রামে বিতরণ করা হয়। এ সম্বন্ধে রিপোর্ট আছে, 'About 299 plants of a large variety of flowers and fruits were distributed free to representatives of different villages. Tree-planting Ceremonies were also

organised in several different villages by villages themselves on the 4th (1938, Sept.)'[২২]

কবি তাঁর কর্মক্ষেত্রের স্বল্প পরিসরের মধ্যেও বিজ্ঞানকে কিভাবে মানবকল্যাণের ভূমিকায় নিয়োজিত করেছেন তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। দেশের কাজ বলতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গ্রামোন্নয়নের কাজ বুঝতেন এবং তার জন্যে কবির বৈজ্ঞানিক প্রয়াস লক্ষণীয়। কৃষি সম্পর্কে কবির চিঠিপত্র এবং নির্দেশনামা তাঁর বাস্তব জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীনিকেতনে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে 'পরীক্ষামূলক খামার' এবং গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। এর মধ্যেই কবির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ধরা পড়ে। একমাত্র জীবিত পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন সাহিত্য বা দর্শন পড়তে নয়, তাঁকে পাঠালেন কৃষিবিজ্ঞান পড়তে।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ছিল বেশ উঁচুতে। তবে গবেষক সৃষ্টি করা স্কুলের এক্তিয়ারের বাইরে। তাই কবির ইচ্ছা ছিল প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে যেন বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ গড়ে ওঠে। আমাদের শিশুদের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কৌতূহলই নেই, অথচ এই কৌতূহলই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল উৎস। শান্তিনিকেতনের শিক্ষণপদ্ধতিতে এ বিষয়ের প্রতিও যথেষ্ট জোর দেওয়া হ'তো। গল্প, আলোচনার মাধ্যমে ছেলেদের মনকে কৌতূহলী করে তোলার চেষ্টা করা হ'তো। এ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে জগদানন্দ রায় ও তেজেশচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। জগদানন্দ বাবু ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থ রচনা করেন আর করতেন গল্প। তেজেশবাবু ছিলেন নীরব কর্মী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি ঘুরছেন, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন নানা গাছ, ফুল, পাখী, পোকামাকড়ের সঙ্গে। অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রতিটি শিশুর কৌতূহল মেটাচ্ছেন। এ ধরণের শিক্ষক নির্বাচনের আশ্চর্য কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। এ ছাড়া ত্রিপুরার মহারাজা স্কুলের জন্য একটা ভাল দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং কিছু গ্রহ-নক্ষত্রের চার্ট দিয়েছিলেন। এ সবের সাহায্যে ছেলেদের গ্রহ-নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হ'তো।

---

২২ Visva-Bharati News 1938 Sep, P23.

এ সব ছাড়া কবি আর একটি আশ্চর্য জিনিস আমদানী করেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায়। শিক্ষার ছলে খেলা যাকে বলে Sense training। বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ এ সম্বন্ধে তাঁর এক গ্রন্থে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

আমাদের একটা খেলা হত মাঝে মাঝে। ইংরেজিতে যাকে বলে Sense training—এটাতে গুরুদেবের খুবই উৎসাহ ছিল। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে হাতে একটা ফুটরুল তুলে তিনি বলতেন—'এই দেখো এক ফুট একটা লম্বা। আচ্ছা, এই দেখো টেবিলের এই পাশটা। বলো ত এটা লম্বায় কত ফুট কত ইঞ্চি। আমরা সবাই বিজ্ঞের মতো সেই দিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে মনে মনে একটা আঁচ করে নিতাম ; তারপর কেউ বলতেন 'চার ফুট দুই ইঞ্চি' ; কেউ বলতেন, 'তিন ফুট এগারো ইঞ্চি'—এই রকম যার যা প্রাণ চায় এক-একজন এক-একটা মাপ বলতেন। তারপর টেবিলের সেই পাশটা ফুটরুল দিয়ে মেপে দেখা হত, যার আন্দাজ আসল মাপের সবচেয়ে কাছাকাছি তারই হত জিত। এই ভাবে, এই দেওয়ালটা লম্বায় কত, এই দরজাটা কত উঁচু, এখান থেকে ঐ ফুলদানিটা কত দূরে, এই সব নিয়ে মাপামাপি চলত খাবার ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত।'[২৩]

এমনি ভাবে ছেলে মেয়েদের ইন্দ্রিয়সমূহকে করে তোলা হতো সচেতন। এ সম্পর্কে ছাত্রদের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য কবি পছন্দ করতেন না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করার প্রচেষ্টা পরবর্তী জীবনে বিশেষ উপকারক কবি তা জানতেন।

২৩ আমাদের শান্তিনিকেতন।

কবির দৃষ্টিতে যন্ত্র ও যন্ত্র-সভ্যতা

অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ কবি, এ কারণেই তিনি যন্ত্র বিরোধী। এ কথা সত্য যে যন্ত্রের জয়গান তিনি খুব বেশী করেন নি, যেহেতু তিনি মনে করতেন যন্ত্র এক সময় এমন প্রচণ্ডতা লাভ করে যার ফলে মানুষও তার দাস হয়ে পড়ে। যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তির প্রকাশ, কবি কখনো তাকে অস্বীকার করেন নি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যন্ত্রের এই শক্তি তো মানুষের শক্তিরই অংশ। যন্ত্র যতক্ষণ প্রাণের সহায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে টিঁকে থাকতে পারে, যন্ত্র যে পর্যন্ত মানুষের কল্যাণ ও আনন্দের অনুকূল সে পর্যন্ত তাকে গ্রহণ করতেই হবে, তা না হলে মনুষ্যত্ব হবে হীনবল। যন্ত্র প্রবল শক্তির আধার। তা মানুষেরই ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ যেন। কবি এই শক্তিকে অভিনন্দন জানান, কিন্তু যখনই যন্ত্র মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বিষাক্ত করে তোলে, মানুষ যন্ত্রের উপকরণ হয়ে পড়ে, জীবনের কল্যাণ, মাধুর্য লুপ্ত হতে চলে তখনই যন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করা প্রয়োজন। যন্ত্রসভ্যতা সম্বন্ধে কবির এ রকমই ধারণা। যন্ত্রবাহন সভ্যতা মানুষের আত্মাকে নিপীড়িত করে ফেলে এ উপলব্ধি করেই কবি বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন তার দিকে।

জাপান ভ্রমণের পথে রেঙ্গুনে পৌঁছে কবি এক পত্রে লিখলেন, 'ইরাবতী নদী দিয়ে শহরের কাছাকাছি যখন আসছি তখন ব্রহ্মদেশের পরিচয়টা কী। দেখি, তীরে বড়ো বড়ো সব কেরোসিন তেলের কারখানা লম্বা লম্বা চিমনি আকাশে তুলে দিয়ে ঠিক যেন চিত হয়ে পড়ে বর্মা চুরুট খাচ্ছে।' বলাবাহুল্য এ দৃশ্য কবির ভাল লাগে নি। এমন কি জেটিগুলি দেখেও তাঁর মনে বিরূপ ভাবের উদয় হলো। তাই জেটি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'সারি সারি জেটিগুলো যেন বিকটাকার লোহার জোঁকের মত ব্রহ্মদেশের গায়ে একেবারে ছেঁকে ধরেছে।' এখানেই একস্থানে তিনি বলেছেন মানুষ এককালে মনে করত বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন। তখন

সত্যিই তা ছিল কারণ বাণিজ্যের সঙ্গে মনুষ্যত্বের বিভেদ ঘটে নি তখন। কিন্তু 'যখন থেকে কল হ'ল বাণিজ্যের বাহন তখন থেকে বাণিজ্য হ'ল শ্রীহীন।' কবি প্রাচীন ভেনিসের সৌন্দর্যের সঙ্গে আধুনিক কালের ম্যাঞ্চেষ্টারের তুলনা করেছেন। ভেনিসে যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ ছিল তার মধ্যে মানুষ নিজেকে বিকশিত করে তুলেছে কিন্তু বর্তমান ম্যাঞ্চেষ্টারে মানুষের প্রকাশ নেই, শুধু বিজ্ঞাপিত হচ্ছে কলের মহিমা। মানুষের ক্ষমতা সেখানে সীমিত, তার স্বীকৃতি অতি অল্প। তাই 'এইজন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে। তাই নিয়ে কাটাকাটি হানাহানির আর অন্ত নেই; তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে ধরাতল পঙ্কিল হয়ে উঠল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্নপরিবেশনের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হ'ল। যাই হোক আমার বলবার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।'[২৪] কল-কারখানা শিল্পবাণিজ্যের প্রসারকে কবি তারিফ করতে পারেন নি বলেই মনে হয়, কারণ কবির আশঙ্কা ছিল যে বাণিজ্যের প্রসারতা ঘটেছে জগতের সর্বত্র, তা কখনোই কল্যাণ আনতে পারে না। বাণিজ্যের অন্যতম পীঠস্থান বন্দরগুলিকে দেখলে কবির অন্তরে জেগে উঠত বিতৃষ্ণা। খিদিরপুর থেকে সুরু করে বন্দরে বন্দরে কবি বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসছেন। তিনি একে তুলনা করেছেন কবিকঙ্কন চণ্ডীর ব্যাধের আহারের সঙ্গে। চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ যেমন প্রচণ্ড এবং উৎকট ভাবে ভোজন করছে, তার নেই কোনো বিরাম তেমনি যন্ত্রবাহন বাণিজ্যেরও আহারের সীমা পরিসীমা নেই। কবির ভাষায় 'লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম করছে এবং লোহার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।'

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সব অতিকায় জন্তুদের কথা আমরা জানতে

---

২৪ জাপান যাত্রী।

পারি তাদের আয়তন দেখলেই মানুষের অন্তরাত্মা কম্পিত হতো। ম্যামথ, ডাইনোসার, ইগুয়েনা ইত্যাদি প্রাণীর দল আকৃতিতে অতি বৃহৎ। দৃশ্যতঃ অতি ভয়ঙ্কর। কবির কাছে যন্ত্রবাহন বাণিজ্য সেই অতিকায় জন্তুর মতো বীভৎস। আধুনিক বাণিজ্যের উৎসস্থল কলে-কারখানায়, জনবিরল স্থানে বিরাট প্রান্তর ঘিরে একদিন গড়ে ওঠে কারখানা, তাকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজন কত সামগ্রীর। প্রয়োজন কয়লা, তেল, লোহা, তামা, সীসে ইত্যাদি কত দ্রব্যসম্ভার। ধরিত্রীর বক্ষ ভেদ করে মানুষ সংগ্রহ করে আনছে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে। আর এই কলকারখানাকে সচল রাখতে হ'লে প্রয়োজন জনশক্তির—তথা কর্মীর। শত সহস্র সংখ্যায় তারা কারখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে যন্ত্রশক্তির প্রখরতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। কবির ভাল লাগে নি। তিনি যেন এর মধ্যে হিংস্রতা, কুশ্রীতা এবং দাসত্বের লক্ষণ অনুভব করেছেন। তাঁর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে ভাষায়, 'তার গায়ের চামড়া ভয়ঙ্কর স্থূল; তার থাবা যেখানে পড়ে সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে, চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ লেজটা যখন নড়তে থাকে তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে দিগঙ্গনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তার পরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা করবার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবল মাত্র থাবা থাবা জিনিস খাচ্ছে তা নয়, সে মানুষ খাচ্ছে—স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।' এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি দানবাকৃতির জন্তুর কথা হয়ত কবির মনে হয়েছে। তাদের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন যন্ত্রকে।

আজ থেকে প্রায় দু'শো সত্তর মিলিয়ন বছর আগে পার্মিয়ন যুগে সরীসৃপের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে। বোধ হয় প্রায় পাঁচ ফিট লম্বা বৃহদাকার উভচর প্রাণীদের হটিয়ে দেবার জন্য এলো এরা। আদিম সরীসৃপের নাম **Pareiasaurus baini**। এরা ভয়ঙ্কর কুৎসিৎ দর্শন। এরা যেমন লম্বা তেমন অসম্ভব ভারী লেজ সহ দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ ফিট দেহ ছিল অসম্ভব ধরণের ভারী। এই বিরাট দেহ নিয়ে চলাফেরা করবার জন্যে মেরুদণ্ড হতো বেশ বড়ো আর মোটা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও তেমনি মাংসল। প্রত্যঙ্গগুলি

ছড়িয়ে থাকে যাকে বলে স্প্রলিং। এদের দেহ এত ভারী যে এ নিয়ে কোন শিকারের পেছনে ছোটা এদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই অগত্যা এরা নিরামিষাশী।

এদের মত আরো এক ধরণের সরীসৃপের সন্ধান জানা গিয়েছিল। তাদের নাম এলজিনিয়া। এদের পিঠে থাকত প্রচুর কাঁটা আর লেজও লম্বা। এরাও সম্ভবতঃ নিরামিষভোজী ছিল।

গ্যালাপোগোস আইল্যাণ্ড বা কুর্মদ্বীপে অতিকায় কচ্ছপ, ইগুয়েনা প্রভৃতির অস্তিত্বের কথা জানা গেছে।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাতে এদেরই উল্লেখ আছে বলে মনে হয়।

ইতিহাস বলে পৃথিবীর আদিম যুগের সেই জন্তুগুলো বেঁচে থাকে নি। তাদের অতিকায়ত্বই শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ছিল না স্ত্রী, তাদের একদিন হার মেনে যেতে হয়েছে। কবির ধারণায় যে এর কারণ বিশ্বের সঙ্গে তাদের কোন সামঞ্জস্য ছিল না বলেই তাদের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। কবির কথায় প্রকৃতি কখনই অমিতাচারকে সইতে পারেন না। যন্ত্রের মধ্যে কবি দেখেছেন অমিতাচার, তার কদর্য রূপ যা মানুষের প্রাণের ছন্দকে দিয়েছে থামিয়ে। তাঁর মনে হয়েছে এই অমিত শক্তিশালী যন্ত্রবাহন বাণিজ্যের অবসান একদিন হবেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বাণিজ্য দানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করছে। একদিন আসছে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এই সর্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবে।"

বাণিজ্যকে কবি বলছেন দানব কারণ তার মধ্যে নেই হৃদয়ের স্পর্শ। মস্তিষ্কের স্বল্পতা তাকে করে তুলেঝে দুঃসহ। জুরাসিক বা মেসোজোইক যুগে যে সব অতিকায় দানবদের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত তারা কেবলমাত্র ওজনেই ভারী, মস্তিষ্কে নয়। একারণেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু প্রাণী টিঁকে গেছে জীবন যুদ্ধে। (এ প্রসঙ্গে আরসোলা এবং পিঁপড়ের নাম উল্লেখযোগ্য) অথচ তারা পারে নি। যন্ত্রবাহন বাণিজ্যেরও সেই দশা হবে এমন আশঙ্কা কবির মনে। আজ কলকারখানা চারদিকে তার বাহু বিস্তার করে চলেছে, বাণিজ্য তার

শাখা প্রশাখা মেলে দিয়েছে নানা দিকে। এ যেন সেই অতিকায় দানব। বিরাট স্থান নিয়ে তার অবস্থিতি। মানুষ আতঙ্কে ভয় পেত তাকে দেখলে। এই শ্রীহীন বাণিজ্যেরও যেন এই দশা। কবি এখানে যেন 'ইকোয়েশন' করতে চাইছেন, যেহেতু দানব জন্তুর দল পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তেমনি হবে এই যন্ত্রবাহন বাণিজ্যের দশা। হয় এর তাণ্ডবতাকে পরিহার করতে হবে নচেৎ তাকে বিদায় নিতে হবে। কবির ভাষায় 'বাণিজ্যদানবকেও একদিন তার দানব লীলা সংবরণ করে মানব হতে হবে। আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় তো একেবারেই নেই ; সেইজন্য পৃথিবীতে ও কেবল আপনার ভার বাড়িয়েই চলেছে। কেবল মাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিততে চাচ্ছে। কিন্তু একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোটো, তার কর্মপ্রণালী সহজ'।

এখানে একটি দিক লক্ষ্য করবার, কবি উপমা দেবার ছলে এনেছেন ক্রম-বিবর্তনবাদের তত্ত্ব। প্রাণি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব ও পদার্থ বিদ্যার প্রতি কবির আগ্রহ ছিল। ডারুইনের সেই বিখ্যাত কথা, 'Survival of the Fittest'-এর কেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। যন্ত্র মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য মাত্র। কবি তাকে মানুষের উপকরণ বলে চিহ্নিত করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতি কবির বিরূপতা যে কখনোই ছিল না তা বোঝা যায়। আমরা দেখেছি বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিকের প্রতি কবির অধিক আকর্ষণ ছিল। যন্ত্র যেখানে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিক বৃদ্ধি করেছে, শ্রমকে করেছে লাঘব, সেখানে তিনি যন্ত্রকে উপেক্ষা করেন নি, যন্ত্রের কিঞ্চিৎ বন্দনা আছে তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে। বন্দনাটি উৎকলন যোগ্য।

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখর মন্ত্রিত, তুমি বজ্রবহ্নি বন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।
তব দীপ্ত অগ্নি-শত শতঘ্নী বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন অচল চলন মন্ত্র
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্র-ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিবদ্ধ কায়া,

কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া।
তবখনি-খনিত্র-নখ বিদীর্ণ ক্ষিতিবিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূতবন্ধন কর ইন্দ্রজালতন্ত্র॥

কোন এক লেখক বলেছেন কবি এখানে যন্ত্রকে মানুষের 'কল্যাণ প্রহরণ' রূপে দেখেছেন, অর্থাৎ যন্ত্রকে কল্যাণের অস্ত্র মনে করেছেন। কিন্তু কবি কি সত্যিই সেখানে প্রাণ খুলে যন্ত্রকে প্রশংসা করেছেন? 'ধ্বংসবিকট দণ্ড' এবং 'পঞ্চভূতবন্ধন কর ইন্দ্রজালতন্ত্র' কথাগুলি ব্যাজস্তুতি বলে যেন আশঙ্কা হচ্ছে।

কবি মানবতার তথা মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে বিচার করেছেন যন্ত্রকে। কবি যে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যন্ত্রের অপরিসীম সম্ভাবনার কথা জানতেন না একথা অনুমান করা ভুল। আবহমানকাল থেকে মানুষের সভ্যতার নানা স্তরে ঘটে গেছে নানা কলঙ্ক, নানা বিভ্রাট মসীলিপ্ত করেছে মানুষের ইতিহাস। অনেকেই তার দায়-দায়িত্ব বিজ্ঞানের তথা যন্ত্রবিজ্ঞানের পরে চাপিয়ে দিয়ে বিচারের কঠিন কর্তব্য সমাধা করেছেন। বিস্ময়ের কথা রবীন্দ্রনাথে তা হয় নি। তিনি যন্ত্রমাত্রকেই অবহেলা করেন নি, যন্ত্র যেখানে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে সেখানে তিনি তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি কখনও বলেননি বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করে প্রাচীন যুগে ফিরে যেতে হবে, বরং সমাজের মধ্যে যে সংঘর্ষ বিরাজ করছে তার সমাধানের প্রচেষ্টা করেছেন সমাজের মধ্যেই। তাকে ত্যাগ করে নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের সুসামঞ্জস প্রয়োগ সামাজিক অবিচার দূর করতে সক্ষম হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রধান নাটক 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকবরী' আলোচনা করা যেতে পারে। এই দুইটি নাটকের মধ্যেই যন্ত্র এবং যান্ত্রিক সভ্যতার কথা আছে। বিজ্ঞান মানুষের আদরণীয় তাতে কোন দ্বিমত নেই কিন্তু যেখানে তাকে প্রাণের ধ্বংস করবার ভূমিকায় পাঠানো হচ্ছে সেখানে সে অভিশাপ, এইটেই কবির মত। তিনি 'কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন, "বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব-মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান দশজনের কাছে গিয়ে পৌঁছয় সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে

ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয়, সেখানেই তার ভয়ঙ্কর পতন। কারণ ইহার প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ডরূপে প্রবল যে আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পরিয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ জগতের সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্বলের দিকে দলন বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে; সকল দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধের উদ্‌যোগ নিত্য হইয়া উঠিতেছে এবং পোলিটিকাল মহামারীর বাহন যে রাষ্ট্রনীতি তাহা নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনায় অন্তরে অন্তরে কলুষিত হইতে থাকিল।' (স্বাধিকার প্রমত্ত) যন্ত্র সম্বন্ধে কবির যথার্থ অভিমত আরও পরিস্ফুট হয়েছে 'মুক্তধারা'য় ধনঞ্জয়ের একটি কথায়—'যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা? তা সে অন্তরেই হোক আর বাহিরেই হোক।'

এখানে যন্ত্রসর্বস্বতায় পীড়িত হচ্ছে মানুষের অন্তরাত্মা, তার মনুষ্যত্ব। তাই অভিজিৎ প্রাণ দিয়ে যন্ত্রকে ভেঙেছে। এই প্রসঙ্গে কবি ডাঃ কালিদাস নাগকে এক পত্রে লিখেছেন, 'তোমার চিঠিতে machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ, সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেন না যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ।'[২৫]

যান্ত্রিকতার কয়েকটি বীভৎস চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এই নাটকে। যন্ত্র যখন প্রবল হয় তখন সে ধ্বংস করে প্রাণকে।

দূত জিজ্ঞাসা করছে যন্ত্ররাজ বিভূতিকে—

দূত: সেই ক্ষেত (চাষার ক্ষেত) শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ-বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

২৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪ খণ্ড, পৃঃ ৫৩২-৩৩

বিভূতি ঃ বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন চাষীর কোন ভূট্টার ক্ষেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত ঃ যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয় নি ?

বিভূতি ঃ না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দূত ঃ ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না ?

বিভূতি ঃ না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

মুক্তধারার ইঙ্গিত সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "দেশ (ভারত) স্বাধীন হইয়াছে। চরকা ঠাকুরঘরে সিকায় উঠিয়াছে, দিকে দিকে যন্ত্রশীর্ষ সমুন্নত বাহু, নদনদীর স্রোত যন্ত্রাবরুদ্ধ। ফল এখনও প্রত্যাশায়। মুক্তধারার বাণী এখন অরণ্যে রোদনের মতো শুনাইলেও ভবিষ্যতে ফলিবে কিনা বলা যায় না।'[২৬]

মুক্তধারা নাটকে বিভূতি বলে উত্তরকূট হলো যন্ত্রের রাজত্ব আর অভিজিৎ বলে এ যন্ত্রোত্তর রাজত্ব। একই স্থানে দুয়ের অস্তিত্ব সম্ভব কি করে? অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী এ সম্বন্ধে বলেছেন, 'মানুষের সামাজিক বিবর্তনের পথে যন্ত্রবাদ একটা অবস্থা মাত্র, চরম অবস্থা নয়। যে বিবর্তনের ফলে মানুষ আজ যন্ত্রবাদে পৌঁছিয়াছে, সেই বিবর্তনেরই আরও খানিকটা অগ্রগতির ফলে সে একদিন যন্ত্রোত্তরবাদে পৌঁছিবে। যন্ত্রবাদ যদি আজকার অবস্থা হয়, যন্ত্রোত্তরবাদ আগামীকাল। বিভূতি আজকার মানুষ, অভিজিৎ আগামী কালের। অভিজিতের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের পূর্ণতর রূপ। ইউরোপে যন্ত্রবাদের উৎপত্তি, আবার ইউরোপের মধ্যেই ইহার প্রতিবাদ আছে। যন্ত্রোত্তরবাদ ইউরোপেই প্রথম দেখা দিবে—তখন ইউরোপ নিজের যান্ত্রিক কীর্তিকে নিজেই নষ্ট করিবে।'[২৭]

'ফাল্গুনী' থেকে 'মুক্তধারা'। মাঝখানে বয়ে গেছে সাত সাতটা বছর। এর মধ্যে পৃথিবীকে সরবিত করে রেখেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবাঞ্ছিত কলরব। যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরে বিরাজ করেছে প্রতিকারবিহীন নৈরাশ্য,

---

২৬ বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস (৩য়) ডঃ সুকুমার সেন।

২৭ রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ (২য়)—প্রমথনাথ বিশী।

ক্ষোভ, বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস। যুদ্ধের অন্তবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ জাপান থেকে আমেরিকা এবং পরে ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করে এসেছেন। ইউরোপের যুদ্ধোন্মাদনা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করলো, তিনি দেখলেন যে ইউরোপ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সৃষ্টি করার গর্বে স্ফীত হয়ে উঠেছিল, তারাই এখন বিনাশ করবার কাজে দম্ভ প্রকাশ করছে। কেবল বিনাশ আর ধ্বংসের আওয়াজ। রবীন্দ্রনাথ এ প্রত্যাশা করেন নি। তাই শিল্প-ভিত্তিক সভ্যতা, তার সামাজিক বিন্যাস, মানুষের প্রকৃত জীবনবেদ ইত্যাদি সম্পর্কে অতি-মাত্রায় চিন্তিত হয়ে উঠলেন, আতঙ্কিত হলেন, মুক্তির উপায়ের অনুসন্ধান করবার প্রেরণায় আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হলেন। আমেরিকা থেকে লিখিত এক পত্রে কবি লিখেছেন, "অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানব-পুরীতে ছিলাম। দানব মন্দ অর্থে বলছিলেন, ইংরেজীতে বলতে হলে হয়তো বলতাম টাইট্যানিক ওয়েল্থ। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক আর কুবের হলো আর—অনেক তফাৎ, লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ। সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোন চরম অর্থ নেই।"

কবি প্রত্যাশা করেছেন সহজ, সত্য, স্বাভাবিক জীবন, কিন্তু এখানে তা পান নি। সর্বদা অনুভব করেছেন, তার "অবাস্তব জীবনপ্রবাহের উত্থিত ধূলিরাশি তাঁহার শ্বাসরোধ করিতেছে"। তাঁর মানসপটে ভারতের অন্যরূপ চিত্র।

'মুক্তধারা'য় কবি দেখিয়েছেন আধুনিক সভ্যতার সংকট। এ যেন মেসিন বনাম আত্মার সংঘর্ষ। নাটকের পরিণতিতে প্রাণেরই জয় ঘোষণা করা হয়েছে। কবি মনে করেন এই ধারণা অভ্রান্ত। কিন্তু সংশয় জাগে যে কবি প্রকৃতই অভ্রান্ত কি না। প্রথমেই বিচার করতে হবে যন্ত্রসভ্যতায় বসবাসকারী মানুষের সমস্যা কোথায়। অভিজিৎ বা ধনঞ্জয় যে বক্তব্য রেখেছে তা কি আজকের মানুষের কথা? যন্ত্র কতটা মানুষের আত্মা বা প্রাণকে আঘাত করেছে এটা কি বর্তমানের কোন সমস্যা? মনে হয়-না।

প্রাণ দিয়ে যন্ত্রকে ভাঙার অলীক কল্পনা কি এখানকার মানুষের মনে জাগে? উত্তর নেতিবাচক। তার সমস্যা অন্যত্র। প্রথম সমস্যা হলো: যন্ত্র মানুষের শারীরিক শ্রম লাঘব করেছে। তার সাহায্যে মানুষ বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে। মানুষের জ্ঞান তার উপলব্ধি সৃষ্টির অনন্ত সম্ভাবনার দরজাকে করেছে উন্মুক্ত। এর কতটা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় সত্যরূপে প্রতিভাত হবে।

দ্বিতীয় সমস্যা: মেশিনের উৎপাদনী শক্তিকে সমাজব্যবস্থাপকেরা তাদের খুশিমত ব্যবহার করছে। তার ফলে সমৃদ্ধির পরিবর্তে আসছে অভাব, কল্যাণের বদলে ধ্বংস, সৃষ্টির বদলে ক্ষয় এসে সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এর থেকে মুক্তিলাভের উপায় কি?

তৃতীয় সমস্যা: জড়শক্তির অন্তর ভেদ করে বিজ্ঞান যে অপরিমেয় শক্তির সন্ধান পেয়েছে তাকে মানুষের সঠিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে না। মানুষের বুদ্ধি আলাদিনের প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন আধাররূপী জড়শক্তিকে কল্যাণের পথে বিনিয়োগ করছে না। তাকে শুভকর পথে পরিচালনা করবার নানা পন্থা আবিষ্কার করা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অন্যতম সমস্যা। পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত মানুষের হিতসাধনের কাজে। বাস্তবানুরাগী হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। তা না হলে জড়শক্তির উপরে মানুষের বিজয় ব্যর্থ হবেই।

রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারায়' যন্ত্রকে আক্রমণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রের নিজস্ব কি কোন সমস্যা আছে? 'machine as such'-এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কি উঠতে পারে? যেহেতু যন্ত্রের ন্যায় অন্যায় বোধ নেই। সে তো নির্গুণ। মানুষই তো তার 'পরে নানা গুণের আরোপ করেছে। তার জন্যেই তো সে সগুণ। যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে, করা উচিত তার সাংগঠনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করা উচিৎ একশ্রেণীর মানুষেরই বিরুদ্ধে। যন্ত্র মানুষকে দিয়েছে অমিত তেজ, শক্তি, ঐশ্বর্য, আবিষ্কারের আনন্দ। জড়প্রকৃতির হাত থেকে মুক্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে তুলেছে সে। প্রকৃতির শাসন মানুষকে বহুক্ষেত্রে করে রেখেছিল অবদমিত। যন্ত্র মানুষকে এ থেকে মুক্তির নিশ্চিত আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন 'যন্ত্রজ মেশিন···মানুষের মুক্তিসাধনার প্রতীক।'

কবির 'মুক্তধারা' যন্ত্রকে এই সম্মান দেয় নি। এখানে সে স্বল্পসংখ্যক মানুষের শক্তি ও অত্যাচারের প্রতীক। অধিকাংশের কাছে বিভীষিকা, প্রাণহন্ত্রী। মানুষের আত্মাকে পীড়িত করাই তার কাজ। যে অভিশাপ যন্ত্রের, যান্ত্রিক সভ্যতারও সেই অভিশাপ। 'মুক্তধারা' নাটকে সেই অভিশাপের এক কাল্পনিক রূপ দিয়েছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রকেই 'অভিশাপ' বলেছেন কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে 'অভিশাপ' যন্ত্রের নয়, তার সংগঠন ব্যবস্থার। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তখন এই তত্ত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন নি যার ফলে তিনি বারংবার যন্ত্রকেই অভিশাপ বলে চিহ্নিত করেছেন।

যন্ত্রসভ্যতার আন্তর বেদনা এবং তার সংঘাতের যে রূপ কবি এই নাটকে দিয়েছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কতটা মিল আছে, কতটা সঙ্গতি আছে এ নিয়েও কথা উঠতে পারে। নাটক থেকে কয়েকটি দৃশ্য তুলে ধরবো। যন্ত্রের চূড়া দেখে রাজাও যেন আতঙ্কিত।

রণজিৎ : দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? আর ওটাকে দানবের মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে।

মন্ত্রী : আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

আর একটি দৃশ্যে 'সুমন' জননী অম্বার প্রাণফাটা কান্না। যন্ত্র যেন তার ছেলেকে গ্রাস করছে।

দূত জিজ্ঞাসা করছে যন্ত্ররাজ বিভূতিকে—

দূত : অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি : অভিশাপ? দেখো উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ঘরে ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে!

বিভূতির কণ্ঠ থেকে যে সব কথা নিঃসৃত হয়েছে তাতে যন্ত্রের কুশ্রী দিকটাই প্রকাশ পাচ্ছে। যন্ত্র শুধু যেন মানুষের সর্বনাশ করতেই এসেছে। তবে "রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের......নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি 'এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাংগঠনিক দিকের উল্লেখ করেছেন কিনা

বোঝা যাচ্ছে না, কারণ তাই যদি হবে তাহলে রাজা নিজেই যন্ত্রের চূড়া দেখে আতঙ্কিত হতেন না।

বটুকের কথার মধ্যে যন্ত্রবাহন সভ্যতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে।

"বলি দেবে, নরবলি! আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, তারা আর ফিরল না।"

৩য় : বলি কার কাছে দেবে খুড়ো?

বটু : তৃষ্ণা, তৃষ্ণা দানবীর কাছে।

রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারায় যে সমস্যার কথা বলেছেন তাও কি মূল সমস্যার সমাধান? তা-তো নয়। যেহেতু সমাজের বা রাষ্ট্রের মূল সমস্যাই তো এখানে বিধৃত হয় নি। ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার মহাশয়ের কয়েকটি কথা ভেবে দেখার মতো। তিনি বলেছেন, 'মুক্তধারার সমস্যা···অবান্তর সমস্যা এবং সমাধানও তাই।'[২৮]

যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আরও বোঝা যায় 'বাতা-য়নিকের পত্রে'। সেখানে তিনি বলেছেন বিজ্ঞানের সাহায্যে বাহুবল নিদারুণ দুর্জয় হয়ে উঠেছে। সবলেরা আজ জল-স্থল আকাশ সর্বত্রই সিংহনাদে তাল ঠুকে বেড়াচ্ছে। তাঁর ভাষায়, 'আকাশ একদিন মানুষের হিংসাকে আপন সীমায় ঢুকতে দেয় নি। মানুষের ক্রূরতা আজ সেই শূন্যকেও অধিকার করেছে। সমুদ্রের তলা থেকে আরম্ভ করে বায়ুমণ্ডলের প্রান্ত পর্যন্ত সবজায়গাতেই বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্ত বয়ে চলল।'[২৯] যন্ত্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথাই বলেছেন, তবে সেটাই তাঁর একমাত্র কথা নয়।

যন্ত্রবাহন সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সভ্যতার ভয়াবহ দিকটাই তাঁর দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। যন্ত্রসভ্যতার ফলশ্রুতিতে মানুষের মনে জেগেছে সোনা সঞ্চয়ের বিকৃত লিপ্সা। প্রাণের দাবি উপেক্ষিত, শুধু ধনের মদিরা পান করে সে দিবারাত্রি মাতাল হয়ে থাকতে চায়। পণ্যোৎপাদনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ আত্মবিস্মৃত। অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করে সে সংগ্রহ করে চলেছে তাল তাল সোনা, আরো পাবার আকাঙ্ক্ষা তাকে উন্মাদ করে তুলেছে।

---

২৮ রবীন্দ্রমানস—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার।

২৯ কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ।

এ মনোবৃত্তির কারণ কিন্তু সেই ধনাসক্ত মানুষেরও অজ্ঞাত। অবকাশকে সরিয়ে চলেছে অনবকাশের উজানী স্রোত, সুন্দর আসক্তি তাকে উন্মনা করে তোলে না। তার শিল্পোৎপাদন বা ধন আহরণের অনুকূল নয় এমন কোন কর্মের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই তার কাছে। যাদের তা অবশিষ্ট আছে তারা আখ্যাত হয় অবাস্তব, অপরিণামদর্শী, অদূরদর্শী ইত্যাদি সংজ্ঞায়। স্বল্পবিত্তের অধিকারী অথচ মনুষ্যত্বের বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আজ উপহসিত, উপেক্ষিত। বিদ্যাশিক্ষার মর্যাদা তখনই দেওয়া হয় যখন সেই বিদ্যার সাহায্যে রাশি রাশি অর্থ আনার সুবিধা ঘটে নচেৎ সেই সব মানুষের দল সমাজের তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হন। মানুষের মর্যাদাও তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। যেহেতু যন্ত্রসভ্যতায় ধন-ই মানুষের শ্রেণী নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি বলে স্বীকৃত হয়েছে, অতএব সেই যুগে অবস্থান করে এক অপ্রতিরোধ্য তৃষ্ণা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। এই তৃষ্ণা তীব্র, দুর্বার এবং বলা বাহুল্য শুভবুদ্ধির বিচারে তা ভয়াবহ। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' বস্তু-রতিতে নিমজ্জমান এক ধনতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতার ভয়ঙ্কর চিত্র। আজ 'পণ্যোৎপাদন সভ্যতা এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছে যেখানে পণ্য আর মানুষের প্রয়োজন মিটানোর সীমায় আবদ্ধ নেই। আপন মহিমায় আপনি সুন্দর, পণ্যানুসন্ধানে লিপ্ত মানুষের উপাস্য।'৩০

যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষের মনুষ্যত্বের কোন মর্যাদা নেই, মানুষকে তার মনুষ্যত্বের বেদী থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, সে পরিণত হয়েছে বস্তুতে। যন্ত্রের বিভিন্ন উপকরণ বা পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন সামগ্রীর মত মানুষও যেন আজ পরিণত হয়েছে বস্তুতে। পার্থক্য কেবল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে, অন্যান্য দ্রব্যসম্ভারের মতো মানুষকেও চিহ্নিত করা হচ্ছে প্রতীক দিয়ে, নম্বর দিয়ে। রক্তকরবীতে তার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে।

"যক্ষপুরের অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোন অর্থে পৌঁছায় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই তুমি কোন সংখ্যা ?

ফাগুলাল : পিঠের কাছে দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ

---

৩০ রবীন্দ্র মানস—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার

বিশু : আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে যারা শুধু জীবনকেই দেখে, একবার ফিরেও তাকায় না অরূপের দিকে, যারা নিজেদের ন্যূনতম স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে বলি দিতে করে না বিন্দুমাত্র দ্বিধা, রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য যারা সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে, যারা বস্তুর আয়োজনে পৃথিবীকে করেছে ভারাক্রান্ত, যাদের দানবীয় যন্ত্রশক্তির নিষ্পেষণে প্রাণরস শুকিয়ে যাচ্ছে, তারা নিঃসন্দেহে পশু। এই যান্ত্রিকতা, লোভ এবং শক্তির নিপীড়নের দিক দেখানো হয়েছে রক্তকরবী নাটকে। যুদ্ধের কোলাহলের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ দেখে এসেছেন পশ্চিমের মানব-বিদ্বেষী উগ্র রাষ্ট্রসচেতনতা, আমেরিকার বস্তুময় যান্ত্রিক সভ্যতা, যার প্রভাব বিশ্বের প্রায় সর্বত্র পড়তে শুরু করেছিল। এ প্রসঙ্গে কবি 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী'তে লিখেছেন, 'কিছুকালের জন্য আমি এই বস্তু অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিশয্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম।' কবি মনে করতেন এই বস্তুসভ্যতা কখনোই চিরস্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। তার ধ্বংস অনিবার্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না; কেন না জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,—সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্য নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরী করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে। এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না।"

(পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী)

'মুক্তধারা'য় কবি অভিজিৎকে দিয়ে যান্ত্রিকতার মূলে আঘাত হানলেন আর 'রক্তকরবী'র জড়শক্তি পরাজিত হলো প্রাণের কাছে। 'রক্তকরবী'তে কবি 'শক্তিদানবের অন্তরেই তার শৃঙ্খলমুক্তির ঝংকার সঞ্চারিত করেছেন।'[৩১]

---

৩১ রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাস।

'রক্তকরবী'র গ্রহণলাগা যক্ষপুরী আলোহীন, আশাহীন। তার জঠরের মধ্যে চলেছে শবসাধনা অগণিত মানুষ নিয়ে। প্রচণ্ড তার দানব-শক্তি। এর বিপরীত মানবীয় বেদনা। মানবীয় বেদনার দিক আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে পুত্রহারা মাতা অম্বার (মুক্তধারা) কাতর ক্রন্দনে এবং বিশু পাগলের (রক্তকরবী) মর্মান্তিক বিশ্লেষণে।

মুক্তধারা নাটকে অম্বার প্রাণফাটা বিলাপ যেন প্রতিটি মানুষের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। আর তার বিলাপ নিঃসন্দেহে নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনা।

'যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের কি শেষ নেই? সুমন কি তবে এখনো চলেছে, কেবলি চলেছে, পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?"

(মুক্তধারা)

'রক্তকবরী'তে পুত্রহারা জননীর কাতর ক্রন্দন শোনা যায় নি, যেহেতু সেখানকার সাধারণ শ্রমিকেরাও যন্ত্রের কবলে পড়ে যন্ত্র হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের জীবনের প্রকৃত বর্ণনা যখন শুনতে পাই, তখনই কি শোনা যায় না তাদের করুণ, প্রাণফাটা বিলাপ? তারা বর্ণনা করছে 'একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে,—বলছে, কাজ করো।' 'আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ, তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে।'

তাদের বেদনাময় জীবনের ছবি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

নন্দিনী: আহা পাগলভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে, এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে।

বিশু: চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে।

কারখানা বা শিল্পসংস্থা সম্পর্কে কবির মনে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। 'রক্তকরবী' রচনার পূর্বে শিল্পকেন্দ্র সমূহের বর্ণনা শোনেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'কবি শিল্পকেন্দ্রসমূহের বীভৎস রূপের বর্ণনা পান, অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে। রাধাকমল অল্পকাল পূর্বে বোম্বাই-এর শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে

দেখিয়া আসিয়াছিলেন ; এই সময়ে তিনি শিলঙে। কবির কাছে প্রায় আসেন ও নানা কথাবার্তার মধ্যে এই প্রসঙ্গটি আসিয়া পড়ে। রাধাকমল লেখককে বলিয়াছেন যে কবি খুব মনোযোগ দিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেন ; তখন কি তিনি জানেন যে কবির মনে একটি নাটকের খোরাক জুটিতেছে।'[৩২]

কবি নিজে হয়তো দু-একটি মিল বা ফ্যাক্টরী দেখে থাকতে পারেন কিন্তু তাই বলে তাঁর ধারণা সমালোচনার উর্ধ্বে তা বলা চলে না। যা হোক এ বিষয় নিয়ে যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে। আবার ফিরে আসি কবির বক্তব্যে। রক্তকরবী সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি নানা সভ্যতার তারতম্যের কথা বলেছেন। কবির ভাষায়ঃ কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উদ্ধার করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার (বলাবাহুল্য কবি এখানে যন্ত্রবাহন সভ্যতার কথা বলেছেন) ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই রচনাটি কবি (বাল্মীকি) তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নব-দূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা সেকালের কথা, না এ কালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালিকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল?

আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষি যে দানবীর লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হয়েছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনে রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে ; নইলে গ্রামে পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তীকালের, অর্থাৎ পরস্ব।...রত্নাকর

৩২ রবীন্দ্র জীবনী (৩য় খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল। হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা, বিশেষতঃ যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি ; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর ; আর একটিতে শান বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।[৩৩]

কবি বলতে চান যন্ত্র এবং প্রাণ, প্রেম ও দার্ঢ্য, আনন্দ ও কর্তব্য এই মিলিয়েই তো জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়। কোন কারণে কোন সমাজে যখন যন্ত্র প্রবল হয়ে ওঠে তখন সমাজ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। এমন অবস্থাতেই আবির্ভাব হয় নন্দিনীর। রক্তকরবীর মকররাজ অমিত শক্তিসম্পন্ন। তার সহজাত বুদ্ধির সঙ্গে মিলন হয়েছে বৈজ্ঞানিক শক্তির। তার ফলে তিনি প্রবল ক্ষমতাশালী। অবশেষে বৈজ্ঞানিক শক্তির উপরে মানববুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

একথা সত্য যে বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে শক্তি, তার বলে মানুষ আজ দশানন, সহস্রাক্ষ। কিন্তু বিপদ ঘটে তখনই যখন কিছু সংখ্যক মানুষ এই শক্তিকে কল্যাণ ধর্মে নিযুক্ত করে না। কবি বলেন মানুষ আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই ক্লান্তি দূর হতো যদি বৈজ্ঞানিক শক্তি আপনার প্রাণ ধর্মের সঙ্গে যন্ত্রধর্মকে মিলিয়ে নিতে পারতো। আজ তো তা হয়ে উঠছে না। কবি আশঙ্কা করছেন যন্ত্রের চাপে মানুষ পীড়িত হচ্ছে। প্রাণ নিপীড়নের জ্বালায় অস্থির। মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারছে। মকররাজও তাই ক্লান্ত, পীড়িত।

যন্ত্রসভ্যতার যুগে মানুষের ধনের প্রতি লালসা যেন উদগ্র হয়ে উঠেছে। চারদিকে ধ্বনি উঠেছে, 'আরো চাই, আরো চাই' এ যেন তৃষ্ণারাক্ষসীর অস্থির কামনা। আধুনিক সভ্যতার এই দিকটি কবি রক্তকরবীতে প্রকাশ

৩৩ রক্ত করবী প্রস্তাবনা, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২

করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনচে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেচে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী। ভুলেচে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যে পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেচে।'[৩৪]

ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার মহাশয়ের বক্তব্যের কিঞ্চিৎ অংশ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য। 'আধুনিক কালের পণ্যোৎপাদক সভ্যতা এবং ঐ সভ্যতার তথাকথিত মুক্তির একটা সুনিবিড় রসসমৃদ্ধ চিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অসামান্য মানবিকবোধে সিঞ্চিত কবিমানস যেন যক্ষপুরীর ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় পুঞ্জ পুঞ্জ পণ্যের স্তূপে স্তূপে পরিভ্রমণ করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনুভব করছে এই সভ্যতার ভয়াবহতা, তার বিকৃত জীবনবোধের বর্বরোচিত অভিব্যক্তি, এবং অনুভব করে শিহরিত হয়েছে তাঁর চিত্ত। যক্ষপুরীর সমস্ত বন্দীমানুষের হয়ে তিনি এই ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়েছেন, এবং প্রকৃত আনন্দময় মুক্তির আস্বাদন লাভের জন্য তাঁর চিত্তের ব্যাকুল আর্তি দুঃসহ বেদনায় মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। এই আর্তি আবেগ উচ্ছ্বাস মথিত মানবিক দরদে উজ্জ্বল। আর তার মূলে গভীর এক প্রশান্তি—যেখানে সমস্ত দ্বন্দ্বের শেষ, সমস্ত বেদনার অবসান, সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি।'[৩৫]

পশ্চিমে গিয়ে কবি লক্ষ্য করেছেন তাদের যন্ত্রসর্বস্বতার দিক, তাদের বাণিজ্যনীতি, রাষ্ট্রনীতির গতি। তাদের কাছে বাইরের প্রয়োজনটাই হয়ে উঠেছে বড়ো। সেখানে তাই মনুষ্যত্বের ডাক সাড়া জাগায় না। লোভ যেন তার হিংস্র দন্ত প্রকাশ করে তেড়ে আসছে। কবি বলছেন, 'সিদ্ধি, যাকে ইংরেজীতে বলে সাক্সেস, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশী হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে

৩৪ যাত্রী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৫ রবীন্দ্রমানস—অরবিন্দ পোদ্দার

না। বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্স্‌ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁটকাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে।'[৩৬]

কবি যন্ত্রপুরীকে মনে করেন মানুষের দানবীয় শক্তি ও দম্ভের প্রকাশ স্থল। এই যন্ত্রের পেষণে এবং শোষণে মানুষের প্রাণ হয়েছে অবরুদ্ধ। আত্মার মহিমা হয়েছে সংকুচিত। কবির মনে হয়েছে কলবুদ্ধি উদ্যত হয়েছে মানুষের কলা-বুদ্ধিকে ধ্বংস করবার বীভৎস কার্যে। এখনকার মানুষ মনে করছে যন্ত্রটাই সত্যি আর সব মিথ্যে। 'রক্তকরবী'তে কায়াগঠনের কালে কবি জোর দিয়েছেন আধুনিককালের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরে। এই ব্যবস্থার ফলে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোক সাধারণ মানুষকে শোষণ করে হয়ে উঠছে স্ফীত-কায়। কবি তাদের বলেছেন, 'কলিযুগে রাক্ষস,'। এদেরই কৌশলে বৃদ্ধি পেয়েছে কলকারখানার সংখ্যা। মানুষ পরিণত হয়েছে যন্ত্রে। রক্তকরবীর স্বর্ণ আহরণের কারখানা মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে। রক্তকরবী রচনার পূর্বে সাতমাস কাল কবি আমেরিকায় ছিলেন। সেখানকার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলাম। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজীতে বলতে হলে বলতাম, 'টাইটানিক ওয়েল্‌থ।' অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ীর ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, 'লক্ষ্মী হচ্ছে এক আর কুবের হল আর—অনেক তফাৎ।'

সমাজের ও রাষ্ট্রতন্ত্রের বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একটা কবিতায়।

আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥ (প্রশ্ন, পরিশেষ)

যন্ত্র বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে ব্যথিত কবির হৃদয়। বিজ্ঞান যদি মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত না হয়, তবে তার জয়যাত্রা দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর।

৩৬ পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী

হয়ত এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কবি রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনায় লিখেছিলেন 'বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত, পা, মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা সেই শক্তি বাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, এমন আভাস নাটকে আছে।'

একথা যেন আমরা কখনো মনে না করি যে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রবিজ্ঞানকে সর্বদাই বিষদৃষ্টিতে দেখেছেন। এক কবিতায় তিনি বরং প্রকাশ করেছেন পৃথিবীর বা প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে রত্ন লুকিয়ে আছে মানুষ তাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, মানুষের মঙ্গল সাধিত হয়েছে। কবি নিঃসন্দেহে কল্যাণকামী বিজ্ঞানের প্রসারতার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন।

'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকার ছিল সংগোপনে
ওগো তায় জাগাইনু রে॥
পোষ মেনেছে হাতের তলে,
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘদিনের মৌন তাহার আজ ভাঙ্গাইনু রে।
অচল ছিল সচল হ'য়ে
ছুটছে ঐ জগৎ-জয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।'

এই 'রাশ' বাগানোতেই কৃতিত্ব। তা না হলেই যন্ত্র আনে বন্ধন। কবি মনে করতেন যন্ত্রবাহন সভ্যতা এবং যান্ত্রিকতা থেকে জন্ম নেয় হিংসাত্মক জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদ। এ যে মানুষের অশেষ ক্ষতি করছে সে কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন। যান্ত্রিকতার শক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে মানুষের সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও আত্মিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে এ কথা তিনি মনে করতেন। তাঁর ভাষায়, 'It is the continual and stupendous dead pressure of this inhuman upon the loving human under which modern world is groaning.' ব্যথার আবরণে কবি যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্পেষণকে অনবদ্যভাবে প্রকাশ করেছেন, তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ডক্টর পি. গুহঠাকুরতা লিখেছেন, 'If the

author has lashed materialism and worldly greed, it is with a silken whip. If he has rebuked tyranny, cruelty and falsehood, it is with a gentle and benevolent kindliness. His satire does not sting, it only awakens pity and understanding'[৩৭] যন্ত্রবাহন সভ্যতার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর রূপ দেখে ব্যথিত কবি যা বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর মূলবক্তব্যটি প্রোথিত। তিনি বলেছেন, 'I have a stronger faith in the simple personality of man than in the prolific brood of machinery that wants to crowd it out. This personality—the divine essence of the Infinite on the vessel of the Finite—has its last treasure house in a woman's heart...The joy of this faith has inspired me to pour all my heart into pointing against the background of black shadows.'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার যে সমাধান দিয়ে গেছেন তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। '...নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া শীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন? এখানে যে সমাজের কথা বলা হয়েছে সে সমাজ ও সভ্যতা সামাজিক বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তার নবরূপায়ণ সম্ভব কি করে? তা হলে তো বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করতে হয়। একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি সমাজেরই কতকগুলি নিজস্ব নিয়মকানুন আছে, তাকে বাদ দিয়ে কোন বিবর্তন বা রূপান্তর সম্ভব নয়। যে পণ্যোৎপাদক সভ্যতার ধারা বর্তমানে চলছে তাকে অনুসরণ করেই পুনর্গঠন সম্ভব, তাকে অস্বীকার করে নয়। রক্তকরবী নাটকের গঠনের সময় রবীন্দ্রনাথ এ সমস্যাগুলি ভালভাবে বিচার করে দেখেছিলেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহ জাগে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আধুনিক সমস্যা বলে কোন পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের উল্লেখ করে কবি বলেছেন রত্নাকর যখন ধর্ষণ পরিত্যাগ করে কর্ষণবিদ্যা গ্রহণ করলেন, তখনই বেজে উঠল তাঁর বীণা।' হয়ত এর মধ্যে দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন আধুনিক সভ্যতাকেও যদি ধর্ষণ বা দস্যুতা,

৩৭ The Bengali Drama

শোষণ ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত না করে কর্ষণ অর্থাৎ কৃষির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলেই মানুষের জীবনে সুখ আসবে, শান্তি আসবে, ফিরে আসবে শ্রী ও সমৃদ্ধি। মানুষ যাপন করবে সাবলীল মুক্ত জীবন। কিন্তু কৃষি সমাজ ব্যবস্থাতেও কি দাসত্ব এবং ধর্ষণ ছিল না? রবীন্দ্রনাথ জমিদার হয়েও কি তা উপলব্ধি করতে পারেন নি? তাঁর এলাকায় হয়ত স্বল্পমাত্রায় চলতে পারে কিন্তু তাঁর পূর্বে!

এর পরেও বক্তব্য আছে। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে যন্ত্রসভ্যতার হাত থেকে মুক্তি পাবার যে সমাধান দিয়েছেন তা সামাজিক ক্রমের নিয়মানুযায়ী হয় নি, এ কারণেই তাকে বৈজ্ঞানিক বলা চলে না। প্রশ্ন জাগে যে সমস্যা তিনি ঐ নাটকে তুলে ধরেছেন তা কতটা ইতিহাস-নিষ্ঠ! তা ছাড়া সামাজিক পরিবেশও কি তাঁর সমস্যার কথা বলে? আমরা যন্ত্রবাহন সভ্যতার আওতায় বাস করেছি। তাহলেও আমাদের দেশে নগর বা শহর কি রাতারাতি গড়ে উঠেছে? তা নিশ্চয়ই নয়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নগর এবং নগর বলতে যা বোঝায় আমাদের দেশে তার সংখ্যা এখনও খুব বেশী নয়। আমাদের সমাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলে এ কথাই কি মনে জাগে না যে এখানে না সামন্ততান্ত্রিক না ধনতান্ত্রিক না যন্ত্রভিত্তিক সমাজ আধিপত্য বিস্তার করছে। আমাদের মনও যেন তেমনি। বিশুদ্ধ নাগর সভ্যতার পরিধিতে বসবাস করলে যে রকম মানসভঙ্গী হওয়া প্রয়োজন তেমনটি কি এখনো হয়েছে আমাদের দেশে? এখনও কি আমরা পুরোপুরি যন্ত্রমেজাজী? তা হয় নি। আমাদের আবেগ আছে, অনুভূতি আছে, আছে উচ্ছ্বাস, আছে সংবেদনশীলতা। যন্ত্রের পাঁচিলে তা ঘা খেয়ে গুমরে মরে। বাস্তবিকপক্ষে যান্ত্রিক মনোভাব গড়ে উঠবার জন্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তার জন্যেই আমরা যন্ত্রের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করি।

এ ছাড়াও নানাকারণে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রবাহন সভ্যতার পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, 'তাঁর (কবির) মানসজগৎ তপোবনের ঔদার্য ও প্রশান্তি দিয়ে নির্মিত। সেই ঔদার্যের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মার কোথায় যেন মিল আছে বলে তাঁর সুগভীর প্রত্যয়। সুতরাং, যে ব্যবস্থায় সেই আত্মার স্বীকৃতি নেই, রবীন্দ্রমানসেও সেই ব্যবস্থার

কোন স্বীকৃতি নেই, বা তার জন্য কোন প্রেম নেই। পণ্যোৎপাদক যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে সেই সভ্যতারই মালিক ও বিধায়ক রাজার আত্মিক বিদ্রোহ সংসাধন করে, এবং আত্মার স্বকীয়তা বিনাশী সভ্যতাকে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে রবীন্দ্রমানস পরিতৃপ্ত হলো। ইতিহাস কিন্তু নির্বাক, অবিচল।' (রবীন্দ্র-মানস)

এবারে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক। যদি ধরে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে আমাদের দেশের প্রসঙ্গ নিয়ে তেমন বলেন নি, বিদেশে যন্ত্রসভ্যতার রূপ দেখে তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন তাহলে অবশ্য আমার বক্তব্যের পুনর্বিচার করতে হবে। ১৯২৬ সালে রক্তকরবী রচনা করা হয়। সে সময় কবির যে ধারণা ছিল ১৯৩১ সালে হয়ত তার কিছু পরিবর্তন ঘটে। সোবিয়েৎ সমাজব্যবস্থায় শোষণ কার্যের বিলুপ্তি (অনেকের মতে চিরবিলুপ্তি) দেখে হয়ত তিনি মনে করেছিলেন যন্ত্রবিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের ফলে শ্রমোপজীবী মানুষের জন্য আলোর বরাদ্দ জুটল।

নাগর সভ্যতা সম্পর্কে কবির অনেক বক্তব্য আছে। একস্থানে আছে, 'ভোগের আদর্শ অপরিমিত বেড়ে উঠে মানুষের যখন বিস্তর উপকরণের প্রয়োজন, যখন অন্যের জন্যে তার সময় ও সম্বল খরচ করবার বেলায় বিস্তর হিসেব করা অনিবার্য, যখন তার জীবিকার উপাদান উৎপাদন করবার জন্যে প্রভূত আয়োজন চাই, তখন তার সভ্যতার বাহন-বাহিনীর বিপুলতায় তার লোকালয় অতি প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। জনতার পরিমিত আয়তনেই মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার ঐক্য সম্ভবপর। তাই পল্লীর অধিবাসীরা কেবল যে একত্র হয় তা নয়, তারা এক হয়। শহরের অতিবৃহৎ জনসমাবেশ আপন অতি বিস্তীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক আত্মীয়তার রক্তস্রোত সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত হৃৎপিণ্ড তৈরী করে উঠতে পারে না। প্রকাণ্ড জনসঙ্ঘ কাজ চালাবারই যোগ্য, আত্মীয়তা চালাবার নয়। কারখানা ঘরে হাজার লোকের মজুরি দরকার, পরিবারের মধ্যে হাজার লোকের জটলা হলে তাকে আর গৃহ বলে না। যন্ত্রের মিলন যেখানে সেখানে অনেক লোক, আর অন্ত্রের (অন্তরের) মিলন যেখানে সেখানে লোকসংখ্যা কম। তাই শহর মানুষকে বাহিরের দিকে কাছে টানে, অন্তরের দিকে ফাঁক ফাঁক করে রাখে।' (যাত্রী)

আমেরিকা গিয়ে কবির ভাল লাগে নি। তাঁর মনে হয়েছিল এ দেশ

যেন ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গ। সেখানে জমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বেশী। যন্ত্রসভ্যতার দাসে পরিণত হয়ে সেখানকার মানুষেরা শুধু সোনা সংগ্রহকেই জীবনের পরমার্থ বলে মনে করেছে। লালসাগ্রস্ত মানুষের দল তাই শিল্পপ্রসারে তৎপর। আর তার ঔরস থেকেই আসবে সঞ্চয়ের অর্থ। এখানে আতিথ্যের সুনিবিড় স্পর্শ নেই, আন্তরিকতা নেই, আছে সন্দেহ। তিনি লিখেছেন, 'কিছুকালের জন্য আমি এই বস্তু-উদ্গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তু সঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম।' (যাত্রী)

কবির ধারণা যান্ত্রিক সভ্যতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতেঃ 'সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে; এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধূলা নিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তারপরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোন চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এসব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' (যাত্রী)

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে পশ্চিমের বিজ্ঞান সাধনাকে স্বাগত জানিয়েছেন কবি। কিন্তু তার যন্ত্র উপাসনাকে ধিক্কার দিয়েছেন। তার কারণ হিসেবে কবি বলেছেন, 'যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানব সম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে, কেন না, স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুললে, অন্তরতম বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে'। (শিক্ষা)

যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে কবির বিরূপ মন্তব্য অভ্রান্ত কিনা তা ভাববার কথা। কারণ যন্ত্রশিল্পের ব্যবহারে মানুষের নিজস্ব সুখ সুবিধার ক্ষেত্রে যে অনেকগুলি বাতায়ন খুলে গেছে তা কি অস্বীকার করতে পারি? শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসব খুবই পরিচিত। শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল উৎসবের দুদিন পরে এই উৎসব হয়। ১৩৪৬ সালের ১২ই ভাদ্র তারিখে হলকর্ষণ উৎসবের ভাষণে কবি মানুষের ইতিহাস আলোচনা করেছিলেন। আলোচনাটি বিজ্ঞানীর, বলার ভঙ্গী কবির। একই আধারে দুই

সত্তার মিলন ঘটাতে বক্তৃতাটি অপূর্ব রসমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। যদিও কবির সমস্ত বক্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন তাহলেও এর কিছু সত্য একথা নিঃসন্দেহ। এ কথাটি আমি বললাম কবির যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে মন্তব্যকে লক্ষ্য করে। আদি অরণ্য চর মানুষ কি ভাবে ধীরে ধীরে কৃষিজীবি হয়ে উঠল, কি ভাবে সভ্যতার নানা শাখা বিস্তৃত হল তার বিশদ আলোচনা করে কবি বললেন যে এমন এক সময় এল যখন মানুষ অরণ্য ধ্বংসে ব্যাপৃত হল। 'অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হঠিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাস হতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্য তাপে দুঃসহ। কৃষি যুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা।...তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্য ঢেলে দিচ্ছে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে-না। আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহু গত শতঘ্নী...। আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংস বন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ, মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা—সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার ললিতকলা।

যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে পরিমিত অন্ন পরিবেষণ করেছেন যা তার স্বাস্থের পক্ষে, তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট, যা এত বীভৎসরূপে উদ্‌বৃত্ত ছিল না।'[৩৮]

ইউরোপ যে সর্বদেশের পরে তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার মূল অনুসন্ধান করতে গেলে একটি সত্যেই উপনীত হতে হয় যে বিজ্ঞান তাকে ক্ষমতা দিয়েছে, সম্ভ্রম দিয়েছে, এনে দিয়েছে সমগ্র বিশ্বে স্বতন্ত্র মর্যাদা। বিজ্ঞানকে সে তার জীবনের সত্য বলে মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানের বিরাট শক্তিকে যদি মূর্তিমান করে তোলা যেত তাহ'লে আমরা নিঃসন্দেহে অভিভূত

৩৮ 'হলকর্ষণ, পল্লীপ্রকৃতি

হয়ে পড়তাম। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন 'বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশপথ খুলে দিচ্ছে।' অথচ যন্ত্রের প্রতি কবি বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। পুনরুক্তি হলেও বলবো তাঁর ধারণা এ বিষয়ে সঠিক ছিল কি না এ বিষয়ে সন্দেহ জাগে। যন্ত্র মানুষকে দেয় আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, আনে নিশ্চিত নিরাপত্তার ইঙ্গিত। কিন্তু যন্ত্রকে মারণযজ্ঞে প্রয়োগ করার জন্য দায়ী কে? যন্ত্র নিজে? না—মানুষ? আলফ্রেড নোবেল যখন ডিনামাইট আবিষ্কারের উল্লাসে মেতে উঠলেন তখন কি ভেবেছিলেন এর ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বলি হতে পারে? তাই বলে কি ডিনামাইট অপ্রয়োজনীয় বস্তু? মানুষের হিতকামী বন্ধু সে কি নয়? এ প্রশ্নসমূহের উত্তরদান বাহুল্যমাত্র। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন কিন্তু ফলিত অধ্যায়কে নয়। কেন? কবির কথাতেই তাঁর কৈফিয়ৎ শোনা যাক্। 'বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের—এই জন্যেই মানুষ তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়ছে; মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে সেখানে মানুষের ফলকামনাকে অতিকায় করে তুললে সেইখানেই সে হল যমের বাহন।' (যাভা যাত্রীর পত্র)

কবি বলেছেন ইয়োরোপ বিজ্ঞানকে করে তুলেছে যমের বাহন। সে দেবতার শক্তি পেয়েছে অথচ পায় নি দেবত্ব। তিনি বলেন পাশ্চাত্য জগৎ তার বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের কাছে আসে নি, এসেছে তার লোভ, লালসা নিয়ে, তার কামনা নিয়ে। বিজ্ঞানের স্পর্ধায়, শক্তির গর্বে, অর্থের প্রাচুর্যে মদমত্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর মানুষদের লাঞ্ছনা দেবার কাজে আনন্দ পেয়েছে ইউরোপ। তার ফল এবার নিজেদের এলাকাতেও প্রবেশ করেছে। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ বিগ্রহকে কবি যন্ত্রবাহন সভ্যতার অন্যতম অভিশাপ বলে মনে করেছেন। পৃথিবীতে মানুষ নিধন যজ্ঞের অগ্নিশিখা যে লোলজিহ্ব হয়ে উঠেছে তাকে নিবারণ করবে কে? এখানে কবি যথার্থই বলেছেন 'সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে? আমি তা বলি নে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম-উপদেশ দিয়ে হবে? তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে সাধনা

ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়। বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।'[৩৯]

আধুনিক সভ্যতার যুগে একটি রিপু মানুষকে ক্রমাগতভাবে উন্মাদ করে তুলেছে, তা হলো লোভ। লোভের মাত্রা যত বাড়ছে, পৃথিবী জুড়ে অশান্তির পরিমাণ সেই অনুসারে বেড়ে চলেছে। শিল্পের প্রসারকে তাই কবি নির্মল দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য আলোচনার যোগ্য। কবি শিল্পের প্রসার যদি কামনা না করে থাকেন তাহলে কি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন? কৃষি সভ্যতা। এখানে আরো একটি প্রশ্ন উঠবে। রামায়ণ বা মহাভারতের যুগে যখন কৃষি সভ্যতার প্রাধান্য ছিল (বিশেষভাবে রামায়ণের যুগে) তখনও কি শিল্পের কোন প্রসার ঘটে নি? লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা কি যুদ্ধ ডেকে আনে নি? বিশেষতঃ যুদ্ধসময়ে যে সমস্ত অস্ত্র বা বাহন ব্যবহৃত হতো তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তো আজকাল কিছু কিছু মিলছে। কাজেই কে বলতে পারে যে সেকালে ফলিত বিজ্ঞানের প্রসার ছিল না। কবি বলেছেন, 'বড়ো বড়ো মুনফাওয়ালা পাটকল চটকল গঙ্গার ধারের লাবণ্যকে দলন করে ফেলেছে দন্তভরেই। মানুষের রুচিকে সে একেবারেই স্বীকার করে নি; একমাত্র স্বীকার করেছে তার পাওনার ফুলে-ওঠা থলিটাকে।'

এখানেও বিচার নিরপেক্ষ হয় নি। পাটকল, চটকল যেগুলো গড়ে উঠেছে তা কি আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিচ্ছে না? একসময়ে এমন অবস্থা ছিল যে বিদেশ থেকে বস্ত্রসম্ভার না এলে, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় না হলে বাজার চলতো না। কবির পরিবারেও এ ঘটনা ঘটেছে। যদি বলা হয়, দেশীয় তাঁতে কাপড় বুনে নিলেই হবে। গান্ধিজী তো চরকার কথা সাড়ম্বরে প্রচার করে গেছেন। কিন্তু তাতে কি দেশের এই বিপুল জনসংখ্যার 'আবরণ' তৈরী করা সম্ভবপর? এর পরে যে প্রশ্ন আসছে তা হলো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনা। স্বদেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের প্রয়োজন সুলভে মেটানো যাবে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ থেকে (বাণিজ্যের সাহায্যে) অর্থ এনে দেশের অভাব দূর করা সম্ভব হবে। তৃতীয়তঃ দেশের মানুষের রুজির সমস্যা কিছু পরিমাণে লাঘব হয়।

[৩৯] নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র—১ শ্রাবণ, ১৩৩৪।

এখন প্রশ্ন আসবে কলকারখানা স্থাপনের স্থান নির্ণয় নিয়ে। সহজে পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসার সুবিধে যেখানে আছে সেখানেই গড়ে ওঠে মিল, কারখানা। তবে একথা সত্য যে অর্থের লালসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির দিকে চলেছে এবং তা নিশ্চিতভাবে অস্বাস্থ্যকর। কবি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন এ যুগের বাইরের দিকটা নির্লজ্জতায় ভরা। যেন পাকযন্ত্রটা দেহের পর্দা সরিয়ে সামনে বেরিয়ে নিজের জটিল অন্ত্রতন্ত্র নিয়ে দোলায়মান অবস্থায় আছে। ক্ষুব্ধ কবির কণ্ঠ বলে উঠল, 'তার ক্ষুধার দাবি ও সুনিপুণ পাক-প্রণালীর বড়াইটাই সর্বাঙ্গীণ দেহের সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। দেহ যখন আপন স্বরূপকে প্রকাশ করতে চায় তখন সুসংযত সুষমার দ্বারাই করে; যখন সে আপন ক্ষুধাকেই সব ছাড়িয়ে একান্ত করে তোলে তখন বীভৎস হতে তার কিছুমাত্র লজ্জা নেই। লালায়িত রিপুর নির্লজ্জতাই বর্বরতার প্রধান লক্ষণ, তা সে সভ্যতার গিলটিকরা তকমাই পরুক কিম্বা অসভ্যতার পশুচর্মেই সেজে বেড়াক—ডেভিল ডান্সই নাচুক কিম্বা জাজ-ডান্স।'[৪০]

যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হলো তাতে হয়ত একথাই মনে হতে পারে কবি যন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। এ কথা বললে কবির প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে এক পত্রে তিনি যা লিখেছিলেন তাতে তাঁর যন্ত্রের প্রতি বীতরাগের কোন ইঙ্গিত নেই। পত্রটি ১৩১৪ সালের পৌষমাসে লেখা। তাহলে কি একথাই মনে করতে হবে যে পরবর্তী অধ্যায়ে যন্ত্রের প্রতি তাঁর বিরূপতা এসেছিল? এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। যদি মেনে নেওয়া যায় কবি যন্ত্রকে অপছন্দ করতেন না, করতেন তার অপব্যবহারকে, তাহলে কবির মনোভাবের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু কবি হয়ত অনেক ক্ষেত্রে মানুষের পরে দোষ না চাপিয়ে দায়ী করেছেন নিষ্প্রাণ যন্ত্রকে। সে যাই হোক বিজ্ঞানীর কাছে লেখা কবির পত্রটির কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করবো। 'কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine, lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেকনিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে।

৪০ যাত্রী

তাহার কতকগুলি কৃষি ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে। সে বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য যোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial school। আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যদি যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা তোমাকে যদি হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই তবে সুরেশকে দিয়া আমার workshop-এর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি ?'[৪১]

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন বিশ্বমানবের সংস্কৃতির মিলনভূমি বিশ্বভারতী। তাতেই কি তিনি তৃপ্ত ছিলেন ? তা নিশ্চয় নয়, যেহেতু তিনি কখনোই ভুলতে পারেন নি স্বদেশের অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্যের নিদারুণ অভাবের কথা, অনুন্নত কৃষি এবং ক্ষীণ বাণিজ্যের মর্মান্তিক অবস্থার কথা। তিনি জানতেন ক্ষুধিতের কানে পৌঁছবে না শিক্ষার বাণী। তার মধ্যে সাড়া জাগাতে হলে প্রথমেই জৈব প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে ফেলা প্রয়োজন। 'তাই ফুটলো শ্রীনিকেতন, নগরের উপকণ্ঠে প্রয়োজন মেটাবার কারখানাঘর। ঘন বিজলী আলোয় ঘেঁষাঘেষি বাড়িতে শ্রীনিকেতনের হাবভাবও যেন ঔপনাগরিক। সমস্ত মিলিয়ে ছোটো, কিন্তু সুন্দর ; বিভিন্ন কারুকর্মের একটি ঘননিবদ্ধ দ্বীপপুঞ্জ। শুনলুম একদল বেরোচ্ছেন বাংলার বিভিন্ন জেলার রাক্ষসী নিরক্ষরতার সঙ্গে যুঝতে ; ওদিকে পড়ে আছে চাষের জমি, এখানে তাঁত চলে, ছুতোর খাটে, ঘোরে কুমোরের চাকা, চামড়া রঙিন রূপ নেয়।'[৪২]

আগেই বলেছি যন্ত্র সম্বন্ধে কবির ধারণা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষি সভ্যতার পরে কবির বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। 'রাজপুতানা' (১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ) কবিতায় কবি কৃষিকর্মের বাহক ও ধারকদের উদ্দেশ করে বলেছেন—

হোতা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস
ওরা কভু আধামিথ্যারূপে

৪১ চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড
৪২ সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু

সত্যেরে তো হানে না বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে
দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্ত মূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে।

যন্ত্র ও যন্ত্র-সভ্যতার উদ্দেশ্যে ঐ একই কবিতার আর একটি পংক্তি ঃ

এদিকে চাহিয়া দেখো টিটাগড়।
লোষ্ট্রে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাখীর পণ্যঝড়।
বণিকের দম্ভে নাই বাধা,
আসমুদ্র পৃথ্বিতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ন মর্যাদা।
প্রয়োজন নাহি জানে ওরা
ভূষণে সাজায়ে হাতি ঘোড়া
সম্মানের ভান করিবার,
ভুলাইতে ছদ্মবেশী সমুচ্চ তুচ্ছতা আপনার। (নবজাতক)

যন্ত্রসভ্যতার পরিণতি কি তাও কবি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। উদ্ধৃতিতেই যথেষ্ট হবে। ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন এখানে নেই। কবির ভবিষ্যবাণী ঃ

শেষের পংক্তিতে যবে থামিবে ওদের ভাগ্যলিখা,
নামিবে অন্তিম যবনিকা
উত্তাল রজতপিণ্ড উদ্ধারের শেষ হবে পালা
যন্ত্রের কিংকরগুলো নিয়ে ভস্মডালা
লুপ্ত হবে নেপথ্যে যখন
পশ্চাতে যাবে না রেখে প্রেতের প্রগলভ প্রহসন।

অথচ সোবিয়েত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি সেখানে যন্ত্রের সার্থকতার কথাও বলেছেন, এবং একটি সত্যের উদ্ঘাটন করেছেন, তা হলো—যন্ত্রের বিষদাঁত আমাদের লোভের মধ্যেই বর্তমান। মানুষের লোভ দুর্দমনীয় হয়েছে বলেই যন্ত্রকে অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে। কবির ভাষায়, 'এ কথা মানি, যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্র মন্থনের মত সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কলতলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসচে। ...কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদকে দোষ দেবো না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে, খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও

থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেচে, কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে শুদ্ধ টান মারে নি; উল্টো যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুরিয়ে দিতে চায়।'[৪৩]

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে গিয়ে কবির দেখা হলো আইনষ্টাইনের সঙ্গে। কবি ও আইনষ্টানের মধ্যে আধুনিক জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আলাপ হয়েছিল। সে সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'তখন আমি বলেছিলাম, আর আজও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিত্মার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ বিধানের অনুকূল —বিশেষতঃ এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব, তখন প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিত্মাবুদ্ধি জীবনে যে সুবিধার সৃষ্টি করেছে তার সুচিন্তিত সদ্ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ জ্ঞানেন্দ্রিয় যেখানে পরাজিত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র সৃজন করে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইনষ্টাইন আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হলো যে, নূতন নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।'[৪৪]

কবি স্বীকার করেছেন যন্ত্রকে আধ্যাত্মিক করে তোলার চিন্তা বৃথা, তা অর্থহীন। যন্ত্রকে যে ব্যবহার করে একমাত্র সে-ই নিজেকে আধ্যাত্মিক করে তুলতে পারে। যন্ত্র থেকে যে মুনাফা আজ মানুষের ঘরে আসছে তার আকৃতি ক্রমেই এত বৃহদাকার হয়ে উঠছে যে তা নিয়ে টানাটানি করতে গিয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকেও খোয়াতে দ্বিধা করে না। কবির আশা বিজ্ঞানই মানুষের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনবে। বস্তু সত্তার নিয়ে জুয়াখেলা সে দেবে কমিয়ে। ১৯৩০ সালের ১০ই নভেম্বর নিউইয়র্কে এক রেডিও বক্তৃতায় কবি বলেছিলেন, 'প্রকৃতির ভাণ্ডারে প্রবেশের যে উপায় বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছে তা এত জটিল যে তা শুধু বিজ্ঞানের অপরিণতিকেই প্রমাণ করবে।' এ যেন প্রথম শিক্ষার্থীর সাঁতার কাটা। এতে প্রচেষ্টাহীন

৪৩ প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৮

৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬২ (শ্রাবন-আশ্বিন সংখ্যা)

সহজগতি অনুপস্থিত। যন্ত্রের এই গুরুভার নানা জটিলতার জন্যে তা অধিকাংশ লোকের কাছে অব্যবহার্য। তাই যন্ত্রকে আসুরিক কারখানাসমূহতে কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে। শ্রমিকদের জীবন স্বাভাবিকতা থেকে উৎপাটিত হয়েছে। তার ফলে দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অমঙ্গলের নাগপাশ থেকে বিজ্ঞান একদিন নিশ্চয়ই আমাদের মুক্তি দেবে এ আশা কবি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান ধনসৃষ্টির পথগুলো প্রশস্ত করে দিয়ে ব্যক্তিগত লোভের প্রচণ্ডতা কমিয়ে দেবে—এই আশায় বুক বাঁধা ছাড়া আর ত কোনো উপায় দেখা যায় না!

যন্ত্র সম্পর্কে কবির মনোভাব ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে। ১৯৩০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক পত্রে কবি লেখেন যে তাঁর সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র শ্রীনিকেতন। শিক্ষাকে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। ছিটে ফোঁটা শেখানো নয়, 'গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষতঃ ফলিত বিজ্ঞান।...ম্যাডাম দিনা আমাদের ইলেকট্রিসিটি ও জল দেবেন কথা আছে; এরই কলঘরের কাজে ছেলেদের হাত পাকাতে হবে।...তা ছাড়া মোটরের কাজ—শুধু গাড়ি চালানো নয়, ওর যন্ত্রতত্ত্ব। কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাত দুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া করে এইটে ঘোচানো চাই।'

এই বছরেরই ২৪শে মে তারিখে লণ্ডনে কোয়েকারদের সভায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন, যন্ত্র সম্বন্ধে সেইটেই তাঁর খাঁটি কথা—'Life creates, machine constructs, জীবন সৃষ্টি করে, যন্ত্র গড়ে; মানুষকে যখন যন্ত্র সাহায্য করে তখনই সে সার্থক, বিজ্ঞান তখনই মহান যখন সে অজ্ঞানকে দূর করে; কিন্তু যন্ত্র ও বিজ্ঞানের যখন অপবিত্র মিলন হয়, তখন ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনে।'[৪৫] পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখিত এই পত্রে কবির মনোভাব প্রকাশিত। মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব এসেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালবেসে ফেলেছেন। শেষ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে এই ভালো লাগার বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। 'সে' গ্রন্থে সুকুমার এঞ্জিনীয়র হতে চলে যায়। 'তিন সঙ্গী' গল্পগ্রন্থের 'নন্দকিশোর' এঞ্জিনীয়র, নবীন মাধবও। যন্ত্র সম্বন্ধে কবির ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল বলেই হয়ত মুক্তধারা বা রক্তকরবীর মত আর কোন নাটক সৃষ্টি করেন নি।

---

৪৫ রবীন্দ্র-জীবনী ৩য়: পৃ ২৭৭: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ কবি। অথচ তাঁর জীবনের প্রথম ধারাবাহিক রচনা বিজ্ঞান নিয়ে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ড্যালহৌসী পাহাড়ে থাকাকালীন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটিকে গ্রহ নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন। নক্ষত্র লোকের যাবতীয় সন্ধান তাঁকে দিতে সচেষ্ট হতেন। পিতৃদেবের মুখে যা শুনতেন তা বালক রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষায় লিখতেন। এ ছাড়া প্রক্টরের রচিত সহজ পাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষ গ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাংলায় অনুবাদ করতেন। সেগুলি তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। 'জীবনস্মৃতি' (১ম সং) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তিনি [মহর্ষিদেব] প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে [অনেক বিষয়] মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন, আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।'

'বিশ্বপরিচয়' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৫ খণ্ড, ১৩৬৫) গ্রন্থেও অনুরূপ কথা বলেছেন। 'তিনি [মহর্ষিদেব] যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'

১৮৭৩ সালের মে-জুন মাস (১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস) থেকে প্রায় পরবর্তী ছয় সংখ্যায় 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এতেই শেষ হয় নি। তার পরেও 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' লেখা আছে। প্রবন্ধটি অত্যন্ত তত্ত্বপূর্ণ এবং দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা মনে করতে দ্বিধা জাগতে পারে। এ বিষয়ে সজনীকান্ত দাস মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লেখেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লেখেন তা তুলে ধরছি।

'পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের

ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্য্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্যরূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোন অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না। ইতি ১৫।১০।৩৯'

কাজেই এর পর এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ জাগতে পারে না। এই প্রবন্ধটিতে অন্য কোন ব্যক্তির সম্পাদনার ছাপ বর্তমান। এটি বাদ দিলে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সামুদ্রিক জীব' প্রবন্ধটিকে কবির রচিত প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। এই প্রবন্ধের শেষে লেখকের স্বাক্ষর স্থলে লেখা আছে 'ভঃ'। ভানুসিংহ নামের এটি অপভ্রংশ হতে পারে। ৺সজনীকান্ত দাস এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধটি বাদ দিলে এইটিই রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।' (শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬) প্রবন্ধটির শিরোদেশে লেখা আছে—

'সামুদ্রিক জীব' (প্রথম প্রস্তাব)

কীটাণু

প্রথম প্রস্তাব লেখা থাকলেও এ রচনা আর অগ্রসর হয় নি। এই প্রবন্ধটির কয়েকটি স্থান থেকে ভাষার নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে :

'এই সমুদ্র, এই জলময় মহা মরুপ্রদেশ, যাহা মনুষ্যদিগের মৃত্যুর আবাস, যাহা শত শত জলমগ্ন অসহায় জলযাত্রীর সমাধিস্থান, তাহাই আবার কত অসংখ্য জীবের জন্মভূমি, ক্রীড়াস্থল। স্থল-প্রদেশ এই জলজগতের তুলনায় কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র। মিশ্লে (Michelet) কহেন, পৃথিবীতে জলই নিয়ম-স্বরূপ, শুষ্ক ভূমি তাহার ব্যতিক্রম মাত্র। পৃথিবীর এই চতুর্দিক ব্যাপী, এই কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত মহাপরিখা যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তবে কি মহান, কি গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়, কত পর্বত, কত উপত্যকা,

সামুদ্রিক উদ্ভিদ-শোভিত কত কানন কত ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড জীব আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই সামুদ্রিক অরণ্যে কত প্রাণী ছুটিতেছে, সাঁতার দিতেছে, বালির মধ্যে লুকাইতেছে, কেহ বা বিশাল পর্বতের গাত্রে লগ্ন হইয়া আছে, কেহ বা গহ্বরে আবাস নির্মাণ করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে, কোথাও পরস্পর মিলিয়া স্নেহের খেলায় রত রহিয়াছে।'

এমনিভাবে ভূমিকা দিয়ে কবি মূল বিষয়ে প্রবেশ করেছেন। কীটাণুদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'এই কীটাণুদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ আছে। কিন্তু গর্ত্ত ভিন্ন অন্য কারণেও ইহারা জন্মলাভ করে। ইহাদের অসংখ্য সঙ্গিগণ হইতে একটি কীটাণুকে স্বতন্ত্র লইয়া যদি অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ইহার দেহের মধ্যভাগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে নিম্ন প্রদেশে কতকগুলি চলনেন্দ্রিয় সূত্র দেখা যাইতেছে। অবশেষে ক্রমশঃ ঐ কীট একেবারে দুইভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এইরূপে দুইটি কীটের জন্ম হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিরও মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন 'আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ' এমন মনুষ্যের মধ্যে নহে। এইরূপে একটি ইনফিউসোরিয়া, যাহা কত যুগ পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহারি খণ্ডাংশ হয়ত আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, দেখা গিয়াছে এক মাসের মধ্যে দুইটি কীটাণুর বিচ্ছিন্ন শরীরে ১০ লক্ষ ৪৮ সহস্র কীটাণু জন্মলাভ করিয়াছে। ৪২ দিনে একটি কীটাণুর শরীর হইতে এককোটি ছত্রিশ লক্ষ চল্লিশ সহস্র কীটাণু জন্মিয়াছে।

এই অতি ক্ষুদ্র কীটাণুর গাত্রেও আবার ক্ষুদ্রতর কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে, বৃহত্তর কীটাণুর গাত্র তাহার নিবাস ও আহারস্থান। ঘন্টাকতক মাত্র এই কীটাণুদিগের জীবন থাকে। কিন্তু একটি আশ্চর্য দেখা গিয়াছে, যাহাতে বায়ু না পায় এমন করিয়া যত্নপূর্বক ইনফিউসোরিয়াকে ঢাকিয়া রাখ, যতদিন পরেই হউক না কেন, গাত্রে একবিন্দু জল লাগিলেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে। এইরূপে এই দুই ঘন্টার জীব শত বৎসর মৃত থাকিয়া আবার মুহূর্তে বাঁচিয়া উঠিতে পারে।'

ক্রমবিবর্তনের জগতে কোন্‌স্থানে উদ্ভিদ পর্যায় থেকে বিচ্যুতি এসে জীবের সূচনা হলো তা আশ্চর্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই

বিজ্ঞানের এ জটিল তত্ত্বটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন—'কোন্‌খানে উদ্ভিদ-শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণীর আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। দেখা গিয়াছে যে, শৈবালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে অ্যাল্‌জি জাতীয় উদ্ভিদে, প্রাণী-জীবনের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান আছে; মনে হয় যেন তাহাদের চলনেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের গাত্রে চলন-শীল যে সূক্ষ্ম-সূত্র লম্বমান থাকে, তাহার দ্বারা তাহারা ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়ায়, তাহা দেখিয়া সর্বতোভাবে মনে হয় যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক চলিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর এবং উদ্ভিদের উৎপাদনী আণবিক রেণুকণা (Fecundating Corpuscles) জলে ভাসিবার সময় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, আবার পুনরায় ফিরিয়া আসে ও পুনরায় সেদিকে ধাবমান হয়। এইরূপে আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, যেন তাহাদের চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। ইহাদের সহিত যদি সামুদ্রিক কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবের তুলনা করা হয়, তবে কাহারা উদ্ভিদ ও কাহারা প্রাণী তাহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। পূর্বোক্ত নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগকে ইয়োরোপীয় ভাষায় জুফাইট (Zoophyte) অর্থাৎ উদ্ভিদজীব বা উদ্ভিদ-প্রাণী কহে।'

১২৮৭ সালের (বঙ্গাব্দ) 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে। লেখকের কোন নাম নেই। প্রবন্ধগুলি হচ্ছে: (১) পৃথিবীর পরিণাম (২) নক্ষত্র আলোক (৩) ভূগর্ভ (৪) পৃথিবীর উৎপত্তি (৫) ভূকম্পন। এর মধ্যে কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচিত কিনা তা গবেষণার বিষয়।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বালক' (১২৯২) পত্রিকার প্রথম বর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'বৈজ্ঞানিক-সংবাদ' শিরোনামায় বারোটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পত্রিকার 'সূচীপত্রে' 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লেখা আছে। অথচ পত্রিকার পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে সেই রচনা 'কার্তিক' সংখ্যায় স্থান লাভ করেছে—অন্ততঃ তাই মনে হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানা প্রয়োজন। যাই হোক, সূচীপত্র অনুসারেই এটিকে অগ্রহায়ণ সংখ্যাভুক্ত

বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। বারোটি নিবন্ধের একটি এই গ্রন্থের অন্য এক অধ্যায়ে আগেই উৎকলিত হয়েছে।

আরো একটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে কবির ভাষার নমুনা দেখান হচ্ছে। 'জলে আগুন জ্বলিতে দেয় না এইরূপ সাধারণের ধারণা, কিন্তু সম্প্রতি বেকর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি কোন জিনিস একেবারে শুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে, তবে তাহা আর জ্বলে না। সম্পূর্ণ শুষ্ক কাঠ জ্বলে না। কিন্তু ইহার পরীক্ষা করা শক্ত। কারণ চতুর্দ্দিকেই জলীয় পদার্থ আছে। বাতাসের মধ্যে জল আছে। গ্যাসে জল আছে। জলকে দূর করা দায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই জলীয় পদার্থ না থাকিলে অতিশয় দাহ্য পদার্থও জ্বলিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে জল জ্বালাইবার সহায়তা করে।'

১২৯৮ সালে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকাতে কবি 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' শিরোনামায় বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব নিয়ে সহজবোধ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' ছাড়াও ঐ পত্রিকায় তাঁর লেখা বিজ্ঞানের প্রবন্ধ আছে। ১২৯৮ সালের সাধনার পৌষ সংখ্যায় কবি 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য' নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেন সেটিই সামান্য পরিবর্তিত হয়ে 'পাঠপ্রচয়' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে। এই প্রবন্ধটিতে শারীর বিজ্ঞান ও জীবাণুতত্ত্ব (Bacteriology) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের কেন, প্রাণিকুলের এবং উদ্ভিদকুলেরও প্রধান শত্রু বীজাণু (বা জীবাণু)। ফরাসী পণ্ডিত লুই পাস্তর জীবাণুকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দরভাবে তা বর্ণনা করেছেন, 'এক দলের নাম দিয়াছেন এরোবি, অন্য দলের নাম অ্যানেরোবি। এরোবিগণ মৃতদেহের উপরি-ভাগে জন্মলাভ করিয়া তাহাকে পচাইয়া অল্পে অল্পে জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। অ্যানেরোবিগণ গলিত পদার্থের নিম্নভাগে উৎপন্ন হইয়া তাহার ক্ষয়সাধন করিতে থাকে; বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন বাষ্প লাগিলেই তাহারা মরিয়া যায় এবং উপরিতলস্থ এরোবিগণ তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে দুইদলে মিলিয়া পৃথিবীর সমস্ত মৃত পদার্থ অপসৃত করিতে থাকে। ইহারা না থাকিলে মৃত্যু অমর হইয়া থাকিত এবং অবিকৃত মৃতদেহস্তূপে ধরাতলে পা ফেলিবার স্থান থাকিত না।

জীবাণুরা রোগসৃষ্টি করে এই কথা কবি বলেছেন তাঁর নিজস্ব নৈপুণ্যে— 'জীবশরীরের অনেক রোগ এই জীবাণুদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারা অনুক্ষণ শনি ও কলির ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ইহারা সেই অবসরে দেহ আশ্রয় করিয়া বসে এবং শরীরের রসকে বিকৃত করিতে থাকে।'

রক্তের লোহিত কণিকা সম্বন্ধে কবি লিখেছেন, 'ভালো অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে রক্তকণা জলের মতো বর্ণহীন দেখায়। তাহার কারণ এই—আসলে বর্ণহীন রসের উপর অসংখ্য লোহিতকণা ভাসিতেছে; খালি চোখে সেই লোহিতবর্ণের কণাগুলিই আমাদের নিকট রক্তকে লাল বলিয়া প্রতিভাত হয়; অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সেই বর্ণহীন রস আমরা দেখিতে পাই না'।

লোহিত কণিকার কাজ সম্পর্কে: 'রক্তের এই কণিকাগুলির বিশেষ কাজ আছে। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি ঐ লোহিত-কণাগুলি তাহার মধ্য হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া লয় এবং শরীরের 'কার্বনিক অ্যাসিড বাষ্প' নামক বিষবায়ু ফুসফুসের নিকট বহন করিয়া আনে এবং আমরা তাহা প্রশ্বাসের সহিত নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিই।'

শ্বেতকণিকা সম্পর্কে কবি লিখেছেন, 'রক্তস্থ শ্বেতকণার কার্য অন্যরূপ। তাহারা প্রত্যেকে অতিশয় ক্ষুদ্র জীবনবিশিষ্ট কোষ। ইহাদের আয়তন এক ইঞ্চির পঁচিশ শত ভাগের এক ভাগ। প্রটোপ্লাসম সর্বাপেক্ষা আদিম প্রাণিপিণ্ড। রক্তের এই শ্বেতকণাগুলি সেই প্রটোপ্লাসমের কোষ।'

১৩০০ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'সাধনায়' তাঁর রচিত 'ঈথর' প্রবন্ধটি মুন্সীয়ানার পরিচায়ক।

১৩০০ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার রবীন্দ্রনাথ 'উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য' নামে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'সাময়িক সারসংগ্রহ' এই শিরোনামায় অনেক প্রবন্ধ মুদ্রিত হতো। এই প্রবন্ধে পদার্থ-বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কবির সুস্পষ্ট জ্ঞানের পরিচয় নিহিত আছে। সামান্য অংশ তুলে ধরছি।

'প্রক্টর সাহেব দেখাইয়াছেন, বায়ুর রিফ্রাকশন বশতঃ সূর্যের দৃশ্যমান

পরিধি লম্বভাবে কমিয়া যায় অথচ পার্শ্বের দিকে বাড়ে না। এমন কি, চন্দ্রের পরিধি লম্বভাবে এবং পার্শ্বভাগে উভয়তই কমিয়া যায়।'

যাহা হৌক, বায়ুর রিফ্র্যাকশনে চন্দ্র সূর্যমণ্ডল ছোট দেখিতে হয়—তবে তাহাদিগকে বড় ভ্রম হয় কেন ?

প্রক্টর বলেন, 'আকাশ আমাদের চক্ষে একটি গোলাকার মণ্ডপরূপে দেখা দেয়। আমাদের মাথার উপরে এই মণ্ডপ যতটা দূর মনে হয়, নিম্নে—দিগন্তের দিকে ইহার সীমা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দূরবর্তী বলিয়া বোধ-হয়। তাহার কারণ, সাধারণতঃ আকাশের উচ্চতা পরিমাপের সামগ্রী বড় বেশি নাই। কিন্তু যখন দেখি, বাড়ি-ঘর, লোকালয়, শস্যক্ষেত, নদী, অরণ্য পর্বত অতিক্রম করিয়াও আকাশ দিগন্তে মিশিয়াছে তখন সেইদিকে তাহার দূরত্ব নির্দেশ করিবার অনেকগুলি পদার্থ পাওয়া যায়। এইরূপে চিরাভ্যাস ক্রমে অজ্ঞানতঃ দিগন্তবর্তী আকাশকে উর্ধ্বাকাশের অপেক্ষা আমরা অনেক দূরস্থ বলিয়া মনে করি। অতএব চন্দ্র সূর্যকে যখন উদয়াস্তকালে দিগন্ত সংলগ্ন দেখি তখন উক্ত সংস্কারবশতঃ তাহাকে অপেক্ষাকৃত বহুদূরবর্তী বলিয়া জ্ঞান হয়, এইজন্য চক্ষে তাহার পরিধি যতটা দেখা যায় মনে মনে তদপেক্ষা তাহাকে বড় করিয়া লই।'

১৩০১ সালের 'আশ্বিন ও কার্তিক' সংখ্যার 'সাধনা' পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ 'ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ' শীর্ষক একটি বড় প্রবন্ধ রচনা করেন। তার কিয়দংশ হচ্ছে এরূপ : 'আকাশে প্রবাহিত বায়ুস্রোতে যে পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস আছে ভূগর্ভস্থ বায়ুস্রোতে তদপেক্ষা অনেক বেশি থাকিবার কথা। কারণ, মাটির সহিত নানা প্রকার জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেই সকল পদার্থজাত কার্বনের সহিত বাতাসের অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিডের উৎপত্তি হয়, ইহা ছাড়া মাটির নীচেকার অনেক পচা জিনিস হইতেও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের উদ্ভব হইয়া থাকে।

মাটির আর্দ্রতা এবং উত্তাপ অনুসারেও এই কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। ম্যুনিক সহরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে আষাঢ় শ্রাবণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া ওঠে, এবং মাঘ ফাল্গুনে সর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়।'

চতুর্থ বর্ষের 'সাধনা' সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ সংখ্যায় যথাক্রমে 'পঞ্জিকার ভ্রম', 'দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি' এবং 'জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্ধারণ' নামে তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকের কোন নাম নেই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে অনুমান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আলোকপাতের প্রয়োজন।

১৩১২ সালে ৭নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে 'ভাণ্ডার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে সম্পাদনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে (বৈশাখ) 'সঞ্চয়' শিরোনামার অন্তর্গত তিনটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'জ্যোতিঃশাস্ত্র' এবং 'বিনা তারে টেলিগ্রাফ' প্রবন্ধ দু-টিতে কোন লেখকের স্বাক্ষর নেই। দ্বিতীয় সংখ্যাতে (জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ 'বিজ্ঞান সভা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি ভাণ্ডারের উক্ত সংখ্যার ৭৪-৭৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল। এতে তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন, 'স্বদেশে বিজ্ঞান প্রচার করিবার [দ্বিতীয়] সদুপায়, স্বদেশের ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করা। যতদিন পর্যন্ত না বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলা দেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।'

দ্বিতীয় সংখ্যার 'সঞ্চয়' অংশে তিনটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ আছে। তার মধ্যে 'জ্যোতিঃশাস্ত্র', 'এন্-তেজ' এবং 'কুয়াশা নিবারণের উপায়' শীর্ষক প্রবন্ধে কোন লেখকের নাম নেই।

'আষাঢ়' সংখ্যাতে ঐ অধ্যায়ে 'সৌর-কলঙ্কের কার্য', 'হিমোগ্লোবিন' শীর্ষক দু-টি প্রবন্ধও লেখকের নামবিহীন। 'শ্রাবণ' সংখ্যাতে 'জীবের উৎপত্তি', 'জ্যোতিঃশাস্ত্র' প্রবন্ধ দু-টিতেও একই অবস্থা। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তবে এগুলি তাঁর লেখা কিনা সে বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের হতে পারে এ সন্দেহ মনে জাগে একারণেই যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লেখকদের স্বাক্ষর বর্তমান। সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র নিজ নাম প্রকাশে কুণ্ঠিত হতে পারেন এ সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

১৩০৮ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় কবি আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন।

'সঞ্চয়' গ্রন্থের অন্তর্গত 'আমার জগৎ' বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ রসগ্রাহী প্রবন্ধ। 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে কতিপয় মূল্যবান প্রবন্ধ আছে

১৩২৬ সালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত দু-টি প্রবন্ধের নাম উল্লেখযোগ্য। 'আষাঢ়' সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির নাম 'খাদ্য চাই'। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, এখানে পুষ্টিকর আহারের অভাব, এদেশের মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় না, এ কারণেই কর্তব্যে বিমুখ। কবির কথায়, 'বড় সভ্যতাকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভুত পরিমাণে দরকার হয়, এজন্য যথেষ্ট আহার্য চাই।······ আমরা যতটা খাই তাহাতে না হয় মরণ, না হয় বাঁচন। কেননা, শুধু কেবল নিঃশ্বাস লওয়াকেই ত বাঁচা বলে না। শিশুর মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশি। কিন্তু যে শিশু মরে না সে যে সম্পূর্ণ পরিমাণে বাঁচিয়া থাকিবার মত আহার পায় না সেইটেই দুঃখ।'

এককালে বাংলা দেশে যথেষ্ট খাদ্য পাওয়া যেত। ডাল, ভাত, শাক, মাছ, ঘি প্রচুর পরিমাণে মিলত। তাতে শরীর পোষণ সহজ হয়েছিল। কিন্তু এখন তা পাওয়া কঠিন আবার খাঁটি জিনিসও দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার 'আশ্বিন ও কার্তিক', ১৩২৬ সংখ্যায় 'আহারের অভ্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আজও যে সকল খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ আছে তাহাদের পুষ্টিকরতা বিচার করিয়া লওয়া এখন আমাদের কর্তব্য। এককালে যে সকল খাদ্য প্রধান-খাদ্যের পারিপার্শ্বিক মাত্র ছিল এখন তাহারাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; ইহাতে কেবলমাত্র আমাদের অভ্যাসকেই তুষ্ট করিয়া শরীরকে হনন করা চলিতেছে। শুধু তাই নয়, পূর্বে আমাদের হাতে সময় যথেষ্ট ছিল, তাই নানাপ্রকার তরকারী রাঁধিবার আয়োজন তখন সহজেই হইত। এখন তেমন বিচিত্র আয়োজনে পাত সাজাইবার জোগাড় করিতে যে সময় ও উদ্যোগ খরচ করা হইতেছে সেটার মত অপব্যয় আর নাই।'

জীবনের উপান্তে উপনীত হয়ে বিজ্ঞানের প্রতি কবির আকর্ষণ তীব্রতম হ'য়ে ওঠে। বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ

রচনার জন্য অনেককে উদ্বুদ্ধ করেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকবছর আগে রচনা করলেন 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের প্রবন্ধ নিয়ে রচিত এই একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অবিকৃত রেখে সাহিত্য করবার অভাবনীয় কৌশল বর্তমান এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭)। গ্রন্থটি বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থটির ভূমিকা অতীব মূল্যবান। বিজ্ঞানাচার্যের কাছে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে কবি যা বলেছেন তা থেকে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি কবির মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োজন যে প্রথম থেকেই তা সজোরে তিনি উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা যে যথোপযুক্ত ভাবে হচ্ছে না সেকথাও তিনি বলেছেন। স্থানান্তরে উদ্ধৃতি-গুলো বসানো হয়েছে। সেই পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল নয়, আজকের দিনে প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আবিষ্কার সম্পর্ক সম্যকরূপে অবহিত থাকা। বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে। জাতীয় জীবনে তার প্রয়োজন অপরিসীম একথাও কবি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়ে কবির লাভ হয়েছিল তাও তিনি স্বীকার করেছেন।

বয়সের ভার ও শরীরের অপটুতা সত্ত্বেও জীবনের প্রান্তসীমায় এসে কেন তিনি তাঁর 'অল্পপরিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ' করেছিলেন, তার কারণ বর্ণনা করে কবি বলেছেন, 'তার এক মাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল।'

বইখানা কেমন হবে সে বিষয়ে তিনি পূর্বাহ্নেই আঁচ দিয়েছিলেন। গ্রন্থের ভাষা যাতে সহজে চলে তার চেষ্টা এতে আছে। তাই বলে 'মাল খুব বেশি কমিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ' করেন নি। যেহেতু 'দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না'। কবির মত হলো, 'যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয় তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে

যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর।'

আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ এই গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে পাঁচটি প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে।

'পরমাণুলোক,' 'নক্ষত্রলোক,' 'সৌরজগৎ,' 'গ্রহলোক,' 'ভূলোক'। এছাড়া আছে 'উপসংহার'।

তিনি সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের আবিষ্কার নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন, তাই বলে প্রবন্ধকে দুর্বল করেন নি। বলেছেন, 'তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্র স্খলন ক্ষমা করে না।'

রচনায় কোথাও ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ একের পর এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ পরিবেশন করে গেছেন এবং অতি দ্রুতভাবে। বক্তব্যের বিষয় অনুসারে স্থান সংকীর্ণ। তার পরে রচনার ভঙ্গী হয়ে উঠেছে অতি গতিশীল।

বিশ্বপরিচয় সম্পর্কে কবি সুরেন্দ্র নাথ মৈত্রকে এক পত্রে (৫।১০।৩৭) লেখেন, 'ডাঙায় নাচতে পারি বলেই জলে সাঁতার কাটার অধিকার যে পাকা হবে এমন কোন কথা নেই। বিজ্ঞান সরোবরের ঘাটের কাছটাতে খুব হাত পা ছুঁড়েছি, প্রাইজ পাব এমন আশা করি নে। বিজ্ঞানের আবহাওয়ার সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনটা চন্দ্রলোকের মতোই। যতটা সাধ্য হাওয়া খেলিয়ে দেবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে মনে ছিল, কিন্তু হাওয়াটা ওজনে ভারী হয়েছে এমন নালিশ কানে উঠেছে। মাল থাকবে অথচ ভার থাকবে না এমন জাদুবিদ্যা ওস্তাদের পক্ষেই সম্ভব।'

একই জিনিস দুটো দিক থেকে দেখা যায়। একটা হলো বিচার বিশ্লেষণের দিক, আর একটা হলো 'কল্পনা অনুভূতির গহন বিপুল রসার্ণবের উদার বিস্তৃতিতে আত্মহারা'। বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে দুটি দিকের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং তার সঙ্গে ভাষার জাদু দুই-ই সার্থক ভাবে বর্তমান।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সিদ্ধান্তসমূহ সাধারণ পাঠকদের কাছেও সুপরিচিত, তার মূলে—সেখানকার বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজস্ব গবেষণার কথা সহজ-পাঠ্য গ্রন্থেও প্রকাশ করেছেন। তার ফলে প্রচারিত

হয়েছে বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বগুলি—জনসাধারণের মনে জেগেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি তীব্র বাসনা। বিজ্ঞানের প্রচার কেবলমাত্র যন্ত্রসম্পদকেই সমৃদ্ধ করেনি, সাহিত্য, শিল্পকলাকেও শ্রীমণ্ডিত করেছে। যে সব কথা শুধুমাত্র পণ্ডিতদের ডায়েরীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা সাধারণের চিন্তার বিষয়ীভূত হলো। রবীন্দ্রনাথ প্রাক-পরমাণুলোক থেকে আরম্ভ করে বিরাট নাক্ষত্র জগতের 'ক্রমবিবর্ধমান চক্রবাল' পর্যন্ত পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন।

একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় 'বিশ্বপরিচয়' কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীদের তথ্যানুবৃত্তি নয়। এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের লেখা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃতি দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

'বিজ্ঞানের যে দীপিকা পশ্চিমের দিগ্‌বধূর হাতে বিধৃত, তার কিরণে আজ পূর্ব-পশ্চিম যুগপৎ আলোকিত। এই তীব্র আলোকে অনেক যুক্তিভিত্তিহীন সংস্কার নির্বিচারে রক্ষিত আবহমান কালের গতানুগতিক মতবাদ অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতিপন্ন হয়ে যাচ্ছে, কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সত্যগুলি উত্তরোত্তর লাভ করছে অভিনব মূল্য ও মর্যাদা। আমাদের অন্তরে মধ্যযুগীয় (medieval) বা পৌরাণিক আদর্শের সঙ্গে নবযুগের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার অহরহ দ্বন্দ্ব। এই ঘাতপ্রতিঘাতের সমন্বয় সাধনে যাঁরা যত্নবান, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী। তাঁর mystical বা অধ্যাত্ম পরিপ্রেক্ষা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে rationalistic বা যুক্তিস্ফুরণোজ্জ্বল বস্তুতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণে। এই আপাত বিরুদ্ধ দ্বৈতাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর স্নিগ্ধ বিলোকন ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের ললাটিক তৃতীয় নেত্রে।' [৪৬]

বিশ্বপরিচয়ের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যারা বৈজ্ঞানিক সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়ে রইল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে একঘরে হয়ে রইল।

প্রাচ্যের কণ্ঠে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সুর যে সুগম্ভীর তানের সৃষ্টি করে, তার স্বরলিপি বিশ্বপরিচয় গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে।

বিজ্ঞানের শলাকা দিয়ে দূর করতে হবে আমাদের অজ্ঞানতার ছানি।

---

৪৬ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, পৃঃ ২৪৬

তা যদি না করি তাহলে চিরদিন তমসাচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হবে। দৃষ্টি আনবার নতুন মন্ত্রের কথা কবি উচ্চারণ করেছেন বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে।

'বিশ্বপরিচয়' থেকে উদ্ধৃতি নিতে হলে সমগ্র বইটাকেই তুলতে হয়। প্রতিটি প্যারাগ্রাফে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আর তার বর্ণনা কি সাবলীল। যদিও ভাষা পূর্বেকার চেয়ে অনেক সরলতা বিমুক্ত।

রেডিয়ম সম্পর্কে কবি লিখেছেন: 'অবশেষে একদিন কী কারণে কেউ জানে না রেডিয়মের পরমাণু যায় ফেটে, তার অল্প একটু অংশ যায় ছুটে; এই ভাঙন-ধরা পরমাণু থেকে নিঃসৃত আলফা রশ্মিতে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় তারা প্রত্যেকে দুটি প্রোটন ও দুটি ন্যুট্রনের সংযোগে তৈরি। অর্থাৎ হীলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুরই সঙ্গে তারা এক। বীটারশ্মি কেবল ইলেকট্রনের ধারা। গামারশ্মিতে কণা নেই; তা আলোকজাতীয়। কেন যে এমন ভাঙচুর হয় তার কারণ আজও ধরা পড়ে নি। এই অপব্যয়ের দরুণ পরমাণুর বাকি অংশ আর সেই সাবেক রেডিয়মরূপে থাকে না। তার স্বভাব যায় বদ্‌লিয়ে। দুটি ইলেকট্রন আত্মসাৎ করে আল্‌ফা কণার পরিণতি ঘটে হীলিয়ম গ্যাসে। এই স্ফোরণ ব্যাপারকে বাইরের কিছুতে না পারে উস্‌কিয়ে দিতে, না পারে থামাতে। চারদিকের অবস্থা ঠাণ্ডাই থাক আর গরমই থাক, অন্য পরমাণুদের সঙ্গে মেলামেশাই করুক অর্থাৎ তার বাইরের ব্যবস্থা যে রকমই হোক তার ফেটে যাওয়ার কাজটা ঘটতে থাকে ভিতরের দিকে। গড়ের উপর রেডিয়মের আয়ু প্রায় দুহাজার বছর, কিন্তু তার পরমাণু থেকে একটা আল্‌ফা কণা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, তার মেয়াদ দিন-চারেকের। তারপরে তার থেকে পরে স্ফোরণ ঘটতে থাকে। অবশেষে গিয়ে ঠেকে সীসেতে'। (পরমাণুলোক)

মহাকর্ষ সম্বন্ধে নিউটনের সময় থেকে ধারণা চলে আসছিল যে দুই বস্তুর মাঝখানের অবকাশের ভিতরে একটা অদৃশ্য শক্তি টানাটানি করছে। এ নিয়ে গণ্ডগোল হলো। মহাকর্ষের ক্রিয়া সময় নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আসতে তার কিছু সময় লাগে। বৈদ্যুতিক শক্তিও আসে ঢেউ তুলে আকাশের বুক দিয়ে। কিন্তু বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও মহাকর্ষের বেলাতে সে রকম প্রমাণ পাওয়া গেল না। আলো বা উত্তাপ পথের বাধা মানে। মহাকর্ষ তা মানে না। এ ছাড়া আরও লক্ষ্য করা গেল কোন জিনিসকে

ঝুলিয়ে রেখে পৃথিবী এবং তার মাঝে যত বাধা থাকুক না কেন, ওজনের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে না। শেষ পর্যন্ত আইনষ্টাইন এসে মিটিয়ে দিলেন গোলযোগ। কবির লেখায়, 'অবশেষে আইনষ্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমন কি আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়। তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষে টানের ছবি সহজ ছিল কিন্তু যে নূতন জ্যামিতির সাহায্যে এই বাঁকা ঝোঁক হিসেব করে জানা যায় সে কজন লোকেরই বা আয়ত্তে আছে? যাই হোক ইংরেজিতে যাকে গ্র্যাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না বলে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।' (নক্ষত্রলোক)

শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে কবি ভারি সুন্দর কথা বলেছেন: 'অঙ্গারিক গ্যাসের ঘন আবরণে গ্রহটি যেন কম্বলচাপা। তার ভিতরের গরম বেরিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং শুক্রগ্রহের উপরিগ্রহের উপরিতল ফুটন্ত জলের মতো কিংবা তার চেয়ে বেশি উষ্ণ। শুক্রে জোলো বাষ্পের সন্ধান যে পাওয়া গেল না সেটা আশ্চর্যের কথা, শুক্রের ঘন মেঘ তা হলে কিসের থেকে সে কথা ভাবতে হয়। সম্ভব এই যে মেঘের উচ্চস্তরে ঠাণ্ডায় জল এত জমে গেছে যে তার থেকে বাষ্প পাওয়া যায় না।' (গ্রহলোক)

'সূর্যের আলো নয় কোটি মাইল পেরিয়ে আসে পৃথিবীতে। গ্রহবেষ্টনকারী আকাশের শূন্যতা পার হয়ে আসতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়। যে প্রচণ্ড তেজ নিয়ে সে বায়ুমণ্ডলের প্রত্যন্ত দেশে পৌঁছয় তার আঘাতে সেখানকার হাওয়ার পরমাণু নিশ্চয়ই ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে যায়—কেউ আস্ত থাকে না। বাতাসের সর্বোচ্চ ভাগে ভাঙা পরমাণুর যে স্তরের সৃষ্টি হয় তাকে নাম দেওয়া হয় এফ ২ (F 2) স্তর। সেখানকার খরচের পর বাকি সূর্যকিরণ নিচের ঘনতর বায়ুমণ্ডলকে আক্রমণ করে। সেখানেও পরমাণু ভাঙা যে স্তরের উদ্ভব হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে এফ ১ (F I) স্তর।

আরও নিচে আরও ঘন বাতাসে সূর্যকিরণের আঘাতে পঙ্গু পরমাণুর আরও একটা যে স্তর দেখা দেয়, তার নাম ই (E) স্তর।

সূর্য কিরণের বেগনি-পারের রশ্মি পরমাণু-ভাঙচুরের কাজে সব চেয়ে প্রধান উদ্যোগী। উচ্চতর স্তরে উপদ্রব শেষ করতে করতে বেগনি-পারের রশ্মি অনেকখানি নিঃস্ব হয়ে নিচের হাওয়ায় অল্প পৌঁছয়। সেটা আমাদের রক্ষে। বেশি হলে সইত না।' 'ভূলোক' গ্রন্থে পরিভাষার সৃষ্টিতে কবির সহজ প্রয়াস লক্ষণীয়। কবি বিজ্ঞানের বহু শব্দের পরিভাষা রচনা করে গেছেন। প্রিজম্‌কে বলেছেন তিন পিঠওয়ালা কাচ, Ultra violet ray-কে বলেছেন বেগনি-পারের আলো, infra red light-কে লাল-উজানি আলো, Corona-কে কিরীটিকা, electricity—বৈদ্যুত, troposphere—ক্ষুব্ধস্তর, stratosphere—স্তব্ধস্তর, এমনি নানা পরিভাষা দিয়েছেন। তেমনি আবার বজায় রেখেছেন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, অ্যাণ্ড্রোমিডা, আম্ব্রা, পেনাম্ব্রা ইত্যাদি। পরিভাষার দিকে খুব বেশি জোর দেবার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন নি, যে-হেতু 'পরিভাষা চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।'

এখানে রবীন্দ্রনাথ কৃত আরো কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উল্লেখ করবো।

Asteroids—গ্রহিকা
Centrifugal—কেন্দ্রাতিগ
Centripetal—কেন্দ্রানুগ
Gravitation—মহাকর্ষ ভারাবর্তন
Mesmerism—সম্মোহন
Miner—খনিক
Positive—ধনাত্মক হাঁ-ধর্মী সদর্থক
Psychoanalytical —মনোবিকলনমূলক
Reflex action—প্রতিবৃত্তিক্রিয়া
Repulsion—বিপ্রকর্ষণ
Tendril—আঁকড়ি
Wind mill—বায়ুচল চক্রযন্ত্র
Harmony—স্বরসংগতি
Charred—অঙ্গারিক
Miner—আকরিক, আখনিক

Collection—আচয়
Elevation—উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিতি
Apparatus—উপস্কর
Granular—কণাকার
Curved line—কুটিল রেখা
Contracted—কুণিত
String—তনিকা
Rarified atmosphere—তনুবাত
Dissolved—প্রলীন
Vital function—প্রাণবৃত্তি
Lithograph—মুদ্রালিপি
Mechinist—যন্ত্রকর্মকার
Manufactory—যন্ত্রগৃহ
Grinding mill—যন্ত্রপেষণী
Irrigation by wind power —বাতপ্রাবর্তিম

রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে সীমাতীতের কবি। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যার এলাকাও সীমাহীন। বহুর মধ্যে একত্বকে প্রতিপন্ন করেছে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম, জটিল তথ্য কবির সূক্ষ্ম অনুভূতিকে দিয়েছে এক বিস্ময়কর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি। একের পর এক রহস্যের কুজ্ঝটি উন্মোচিত করে চলেছে বিজ্ঞান। কবি আনন্দিত, বিস্মিত জ্ঞানের সেই জ্যোতির্লোকে বিচরণ ক'রে। বিজ্ঞান যে রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত করেছে, তাতো কাল্পনিক নয়, তা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও গণনার অঙ্কফল। বিজ্ঞানের আনন্দ কবির স্নিগ্ধ লেখনীর স্পর্শে ঘনীভূত হয়েছে সান্দ্ররসে।

শিল্পী যেমন মণিমুক্তা দিয়ে রচনা করে কারুচিত্র, তেমনি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের মণিমুক্তাজহরত দিয়ে কবি রচনা করেছেন নিখিল বিশ্বের এক অপূর্ব আলেখ্য। 'বিশ্বপরিচয়'কে বলা যেতে পারে নব্যবিজ্ঞান গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের এক অধ্যায়। আমাদের আহ্বান করেছেন কবি—বলছেন, 'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম।'

বঙ্গের পাঠককুল এই বিশ্বরূপকে নমস্কার ক'রে বলে

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।

তবুও প্রশ্ন জাগে। বিশ্বপরিচয়ের ভাষা অনুকরণ করা শক্ত। বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের ভাষা কতটা কাব্যমণ্ডিত হওয়া উচিত তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বিশ্বপরিচয়ের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র—যেহেতু এর হালকা আমেজ পাঠককে দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে হাঁফ ধরিয়ে দেয় না—বরং এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। ভাষা যেন হাল ফ্যাসানের অলঙ্কার দিয়ে তৈরী রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, কোথাও ঠোক্কর খায় নি, থমকে দাঁড়াতে হয় নি—তথ্যের যাথার্থ্যের কোন অবমাননা তো হয়-ই নি, বরং চলবার সময়ে অলঙ্কার-শিঞ্জিনী শোনা গেছে—তাতে ঝিমুনির হাত থেকে রচনা বেঁচে গেছে। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে একই সঙ্গে সহজ ও সজীব করে তোলা দুর্লভ শক্তি সম্পন্ন মানুষের কাজ। শুধু তা হলেই চলবে না 'সারং যথা ক্ষীরাম্বুমধ্যাৎ' অর্থাৎ নীর থেকে

ক্ষীর তুলতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরাজিকে সাহিত্যের সৌন্দর্যালোকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার শক্তি। তার জন্যে চাই বিজ্ঞানে অধিকার এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপম ক্ষমতা। এ কাজে প্রয়োজন সুকঠিন সাধনার। বিজ্ঞানের কঠিন অঙ্গ থেকে রস নিঙ্‌ড়ে বের করা নিঃসন্দেহ দুঃসাধ্য কর্ম। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ্য করে লেখা ভূমিকাতে তিনি সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়ে বলেছেন, 'অনধিকার প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জিত বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হোলো না।······যাই হোক, আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।'

একথা সত্য যে কবির মৃত্যুর তেরো বছর পরে আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ সহজবোধ্য ভাবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা জোরালো হচ্ছে। বিশ্বপরিচয়ের মত একখানা বই লিখতে পারলে অনেক বিজ্ঞানী যে গৌরব অনুভব করবেন তাতে দ্বিমত নেই।

রবীন্দ্রনাথ কখনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে যশোলাভ করতে চান নি। বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর যে জ্ঞান ছিল তাতে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই বিরাট দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন সাহিত্যরসিক বিজ্ঞানীদের উপরে। একারণেই বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা অতি সীমিত।

কবি ও বিজ্ঞানী (১) জগদীশচন্দ্র বসু

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমাংশের উল্লেখযোগ্য ঘটনা জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বিজ্ঞানপ্রীতি কবিকে জগদীশচন্দ্রের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

দুই বিভিন্ন দিকের দুই দিকপাল—জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। জগদীশ-চন্দ্র বিজ্ঞানলক্ষ্মীকে তার সুয়োরাণী করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ কাব্য সরস্বতীকে। আপাতদৃষ্টিতে দুই পরস্পর সমান্তরাল রেখা। অথচ দুই রেখা একবিন্দুতে মিলিত হয়েছিল। দুই বিরাট প্রতিভার চিন্তাধারার সূত্র বোধ হয় অনেকটা সমধর্মী। তাই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল গভীর। বিজ্ঞান ও কাব্যের ঘর কিছু আলাদা, কিন্তু তাদের মধ্যে চলাফেরা, মেলামেশা বা দেনাপাওনা চালাবার ছিল এক বাতায়ন। এই কারণে কবি ও বিজ্ঞানী উভয়ে নিজেদের মনের খোরাক উভয়ের কাছ থেকে পেতেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল বিজ্ঞানানুগ, তাঁর প্রবৃত্তির মধ্যে ছিল বিজ্ঞানের কৌতূহল। সাহিত্য সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রও তেমনি।

রবীন্দ্রনাথ যখন জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন তখন বিজ্ঞানীর নাম মোটেই প্রচারিত হয় নি, কবির তো নয়-ই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রবল সুখ দুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্যে যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তার খুব কাছে এসেছি। বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না।'

১৮৯৬ সালে আচার্য বসু ইউরোপ থেকে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথ জগদীশ-চন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে। তখন থেকেই কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর সখ্যতা বাড়তে থাকে। কবি এই বিশ্বজগতে তাঁর অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে অরূপকে দেখতে পান। তাকেই তিনি রূপের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরিয়ে যায় কবির দৃষ্টি ও ভাব সেখান থেকে অরূপের দিকে ধাবিত হয়। বৈজ্ঞানিকও ঠিক তেমনি।

তাঁর পন্থা স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সঙ্গে তার ঐক্য আছে। শ্রুতি যেখানে নিস্তব্ধ, সেখান থেকে তিনি সুরের রেশ সীমার মধ্যে টেনে নিয়ে আসেন। প্রকাশের অতীত যে বস্তু, বৈজ্ঞানিক তাকেই ব্যক্ত করে তোলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহের জন্যেই কবি বিজ্ঞানীকে লিখেছিলেন ঃ 'যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্মের ক্ষতি করিও না ; যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয়, সে ভার আমি লইব।'

জগদীশচন্দ্রকে আর্থিক সাহায্য দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুণগ্রাহী ত্রিপুরাধীশ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে যে পত্র লেখেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানীদের ও বিজ্ঞান চর্চার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন পাওয়া যায়। 'জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি—আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত না হইয়া থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না। আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক—এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।' অসময়ে দেশে ফিরলে পাছে জগদীশচন্দ্রের কর্ম সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে রবীন্দ্রনাথ এই আশঙ্কা দূর করতে পারতেন না। তাই তিনি সর্বদাই উৎসাহ দিয়ে তাঁকে পত্র দিতেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ রবীন্দ্রনাথকে লিখতেন, 'আমি ভবিষ্যতে কি করিব, এ সম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর লিখিও। আমার সময়ের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় লিখিও।' লণ্ডনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মহলে বক্তৃতা দান ও পরীক্ষার প্রদর্শনী দেখানোর পর জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা হলো জার্মানী, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ঘুরে তাঁর আবিষ্কার জগৎ সমক্ষে প্রচার করবার। পরামর্শ চেয়ে পাঠান অকৃত্রিম বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, 'যদি পাঁচ-ছ বৎসর

তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্য প্রস্তুত হোয়ো।...তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য দরকার হবে। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধহয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে জগদীশচন্দ্র বিদেশে গিয়েছিলেন। ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। তাঁর আশঙ্কা ভারত সরকার আর ছুটি মঞ্জুর করবেন না। রবীন্দ্রনাথকে একথা বিজ্ঞানী জানালে তিনি পত্র দেন, 'তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা উদ্ধার তুমিই করিবে। আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।'

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে বাংলায় প্রথম লেখেন রবীন্দ্রনাথ। জড়পদার্থের মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্ব বা সজীব পদার্থের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়—জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণায় কবি উল্লাসে ভরপুর। বিজ্ঞানীর নতুন গবেষণার উপর কবি প্রবন্ধ রচনা করলেন, 'জড় কি সজীব?' কবি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বুঝিয়েছিলেন দেখে জগদীশচন্দ্রও কম বিস্মিত হন নি।

১৮৯৫ সালে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'যাকে আমরা অন্যায় পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে। নইলে কখনই নির্জীবের প্রতি জীবের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোনো জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি। নইলে আমাদের উভয়ের জন্য দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত।'[৪৭]

জগদীশ-প্রশস্তির সময় তিনি জানালেন, 'আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে, তাহা ঐক্যের পথ।

৪৭ কাব্যগ্রন্থ—মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাঃ, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

বিজ্ঞান এ পর্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর কয়েকটি বাধা পাইয়াছে। তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষার হাক্সলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র জড় ও জীবের ঐক্য-সেতু বিদ্যুতের আলোক আবিষ্কার করিয়াছেন।'

জগদীশচন্দ্রের নিজের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বাংলায় তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে কিছু লিখবেন। কিন্তু লিখবার কথা খুঁজে না পাওয়াতে মনের ইচ্ছা চেপে যেতে হয়েছিল তখন। রবীন্দ্রনাথ সহজেই বৈজ্ঞানিক সত্য অক্ষুণ্ণ রেখে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার আভাস বঙ্গদর্শনে লিখতেন। জগদীশ-চন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বন্ধুকে প্রশংসা করেছেন এ কাজের জন্যে। 'জড় কি সজীব?' প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি।

'সজীব মাংসপেশীকে যদি চিমটি কাটা যায় বা তাহাতে মোচড় বা চাপ দেওয়া যায় তবে তাহা লম্বায় ছোট হইয়া চওড়ার দিকে ফুলিয়া উঠে। চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থানপতন রেখা আঁকিয়া নেওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গ রেখা (Curve) করাতের মত দন্তর হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে; দেহবিদ্‌গণ বলেন, দেহ ও পদার্থের মধ্যে এই সাড়াই জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ, মৃত পদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। ধাতু পদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গ রেখা পাওয়া যায় তাহা দন্তর। সেই তাড়না আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গ-রেখা নিরন্তর স্ফীত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা প্রকাশ করে। শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাড়ের প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্য বিশেষের অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্য বিষের কাজ করে।' ৪৮

---

৪৮ জড় কি সজীব?—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩০৮

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি, কবি বিজ্ঞান নিয়ে কিরূপ অনুশীলন করেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি কবির আকর্ষণ সহজাত ছিল বলে আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে বিজ্ঞানকে মুখ্য আসন দেবার জন্যে তিনি আগ্রহী ছিলেন। এক ইংরেজী প্রবন্ধে তিনি তাঁর এই মত ব্যক্ত করেছেন… 'modern science is Europe's great gift to humanity for all times to come—we in India, must claim it from her hands, and gratefully accept it in order to be saved from the curse of futility by lagging behind. We shall fail to reap the harvest of the present day if we delay". ৪৯

রবীন্দ্রনাথ যেমন জগদীশচন্দ্রকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি জগদীশচন্দ্রও তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুকে জগৎসমক্ষে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সমন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কয়েকটি প্রবন্ধে ও গ্রন্থে আছে।[৫০] উৎসাহিত পাঠকদের সেগুলি পড়বার অনুরোধ করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ছিল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ফল্গুপ্রবাহ। তাই জগদীশচন্দ্র বারবার রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন—'তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।'

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অনুসন্ধান করলে একথা সহজেই অনুমেয় যে জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর কর্তব্যকে কেবল মাত্র বন্ধুকৃত্য আখ্যা দিলে সুবিচার করা হবে না। বিজ্ঞানীর জন্যে যে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নেমেছিলেন তার প্রধান কারণ তিনি এদেশে বিজ্ঞানচর্চার পথ প্রশস্ত করে দেবার কাজে অতি উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।

---

৪৯ Creative Unity, 1921, P 193

৫০ (১) জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—পুলিনবিহারী সেন বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৫শ বর্ষ (কার্ত্তিক-পৌষ) পৃঃ ১৩১—১৪২

(২) জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—অমিয়কুমার মজুমদার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা—১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা পৃঃ ৬৬৫—৬৬৯

(৩) চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অব্যক্ত : জগদীশচন্দ্র বসু

কবি ও বিজ্ঞানী (২) আইনষ্টাইন

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনষ্টাইনের সাক্ষাৎকার আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২৬ সালের ১১ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কবি বার্লিনে ছিলেন। তখন আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

১৯৩০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় বারের জন্য সাক্ষাৎ হয়। এ সময়কার সাক্ষাৎকারের বিবরণের বঙ্গানুবাদ ১৩৬২ সালের বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদক শ্রীকানাই সামন্ত।

আইনষ্টাইন কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ভগবৎ-সত্তায় আপনার বিশ্বাস আছে কি?' কবি জবাব দেন, 'বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের অপ্রমেয় সত্তায় নিখিল বিশ্বের ধ্যান ও ধারণা। মানুষী সত্তায় গৃহীত হতে পারে না এমন কিছুই তো দেখা যায় না; কাজেই বিশ্বের যা সত্য তা মানব সত্য। একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যাক—জড়পদার্থ যে-সব প্রোটন ও ইলেকট্রনে গঠিত তার মাঝে মাঝে আছে অবকাশ, কিন্তু জড়বস্তু তবু ফাঁপা দেখায় না, কঠিন ও সংহত বলেই মনে হয়। তেমনি অগণ্য ব্যষ্টির সমাবেশে সমষ্টিমানব, মানবিক সম্পর্কের প্রসাদে তারা যুক্ত, আর সেই কারণেই মানুষের সংসার একটি জীবন্ত সংহতি। মনুষ্যেতর বিশ্বভুবনও একই প্রকারে মানুষের সঙ্গে যুক্ত। এ হল মানবিক ভুবন। আমার এই ভাবনা-সূত্রের সত্যতা ও সার্থকতা আমি দেখেছি সাহিত্যে, শিল্পে ও মানবজাতির অধ্যাত্মচেতনায়।

(বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬২)

এর পরে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুজনের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। সোবিয়েৎ রাশিয়া থেকে ফিরে কবি মেণ্ডেলদের বাড়িতে আছেন সেই সময়ে। সে সময়কার কথাবার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তখন আইনষ্টাইনকে বলেছিলেন, 'আজ ডাক্তার মেণ্ডেলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল,—গণিত-

শাস্ত্রের যে সব নূতন আবিষ্কার তাতে বলে পরমাণুর জগতে অনেক কিছুই আকস্মিক। যা কিছু বিদ্যমান সকলেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব পুরোপুরি পূর্বনিরূপিত নয়।'[৫১]

আইনষ্টাইন বললেন যে সব তথ্যের জন্যে বিজ্ঞান এই মতের দিকে ঝুঁকে পড়েছে তারা কার্যকারণবাদকে বিদায় দেয় না একেবারেই।

রবীন্দ্রনাথ তা মেনে নিয়ে মন্তব্য করলেন যে তাঁর মনে হচ্ছে যে সৃষ্টির মূল উপাদানগুলির মধ্যে কার্যকারণত্ব নেই, অন্য কোন একটা শক্তি তাদের নিয়ে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্ব গড়ে তোলে।

বিজ্ঞানী বললেন, 'এই শৃঙ্খলাটা যে কেমন তা আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, একটা উচ্চতর স্তর থেকে। যেখানে বড় বড় উপাদানগুলি পরস্পর সংযোগের মধ্যে সৎপদার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানে আমরা দেখি শৃঙ্খলা—কিন্তু ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলির মধ্যে নেমে এলে এই শৃঙ্খলাটা আর দেখা যায় না।'[৫১]

রবীন্দ্রনাথ আইনষ্টাইনের গবেষণা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক পার্ষদদের কাছে বুঝতে চেষ্টা করতেন জটিল গবেষণার সাধারণ অংশ।

আইনষ্টাইন সম্পর্কে কবির উক্তি স্মরণীয়। 'একক নিঃসঙ্গ মানুষ বলে আইনষ্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর জড়বাদকে তূরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যান-ধারণার সীমান্তচুম্বী, সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে—জগৎ থেকে—নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রভৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার—তার এক অপরিসীম সার্থকতা আছে।'

৫১ বিচিত্রা (১৩৩৮)—আশ্বিন, 'রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইন'—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত।

কবি ও বিজ্ঞানী (৩) সত্যেন্দ্রনাথ বসু

তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ তখন ছাত্রসমাজে কোহিনূর—চিন্তাশীলরূপে তখনই খ্যাতি অর্জন করেছেন, ততোধিক বিখ্যাত জ্ঞানের সর্ববিধ রাজ্যে তাঁর সদৃপ্ত পদক্ষেপের জন্য। এহেন অবস্থায় ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে বন্ধু শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেবের মধ্যস্থতায় এবং প্রমথ চৌধুরী ম'শায়ের একান্ত আগ্রহে সত্যেন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্রের' আসরে যোগদান করেন। তারপরে 'বিচিত্রা'র আসরে তিনি নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন প্রায়ই, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কখনো যেচে কবির সঙ্গে আলাপ করতে যান নি। তিনি সে আসরে শ্রোতা হিসেবেই থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বিজ্ঞানীর বাসগৃহে তাঁর নিজস্ব কক্ষে দুটি মাত্র প্রতিকৃতি টাঙানো আছে—একটি আইনষ্টাইনের ও অপরটি রবীন্দ্রনাথের।

১৯২৫-১৯২৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথ আইনষ্টাইনের আমন্ত্রণে জার্মানী যান। তিনি দেশে ফেরবার পর রবীন্দ্রনাথ জার্মানীতে যান এবং আইনষ্টাইনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। কথাপ্রসঙ্গে আইনষ্টাইন তাঁকে ভারতীয় গণিতবিদ্ বোসের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এ বোস যে কে তা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন নি। আইনষ্টাইন তাঁকে বলেছিলেন, এই বোস এমন একজন গণিতবিদ্ যাঁর প্রতিভায় যে কোন দেশ গর্বিত হতে পারে। দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ 'বোস'কে খুঁজে বের করেন ও আমন্ত্রণ করেন শান্তিনিকেতনে। মনে হয় বিচিত্রার আসরে উভয়ের দেখা হলেও ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ ঘটেনি, সে কারণেই কবির কাছে 'বোস' নামটা তখন অচেনা ঠেকেছিল।

ক্রমে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনষ্টাইনের নাম জড়িত হয়ে বিজ্ঞানের রাজ্যে এক বিশেষ অধ্যায়ের সৃষ্টি হলো। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এসব সংবাদ রাখতেন বলেই মনে হয়। কবি, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে চিঠিপত্রও লিখতেন।

'বিশ্বপরিচয়' লেখার দায়িত্ব প্রথমে ছিল সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনগুপ্তের উপর। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক। শেষ পর্যন্ত কবি নিজেই লেখার ভার নিলেন। বইখানা লেখার পর কবি সত্যেন্দ্রনাথকে তা একবার দেখে দিতে বলেন। বিজ্ঞানাচার্য তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁর কথায়, 'আমি আর কী দেখবো! তিনি লিখেছেন এই আমাদের ভাগ্য। কিছুদিন পরে দেখি প্রীতিভাজনেষু দিয়ে বইখানা আমার নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।'

আচার্যদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম কেন 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। প্রশ্নটা বুদ্ধিমানের নয়, তা সত্যি, তবুও বিজ্ঞানাচার্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'কেন দিয়েছিলেন তাতো জানিনে, বোধহয় কবি আমাকে স্নেহ করতেন।'

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক বসুকে স্নেহ করতেন, শ্রদ্ধাও করতেন। কিন্তু এইটেই বিশ্বপরিচয় উৎসর্গ করবার একমাত্র কারণ বলে মনে হয় না। মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় তিনি খুব পেয়েছেন বলে মনে হয় না। দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকার জন্যে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড় ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আজীবন বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাঁকে উল্লসিত করতো। তিনি কামনা করতেন ভারত বিজ্ঞান সভায় ভালো আসন পাক। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছেন—সেই কারণে তাঁর প্রতি কবির শ্রদ্ধা-মিশ্রিত স্নেহ ছিল। তাঁর সাহচর্যে কবি খুশি হতেন। এই খুশিরই প্রকাশ বিশ্বপরিচয়ের উৎসর্গ পত্রে। মৃত্যুর কিছু আগে কবি শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে বারে বারে বলেছিলেন, 'সত্যেনকে লিখো তিনি যদি দোলের ছুটিতে আসতে পারেন তাহলে খুশি হবো।'

১৩৪৭ সালের দোলের সময় ঢাকায় চলেছিল রক্তের হোলিখেলা। সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা ছেড়ে আসতে পারলেন না। সেবার কবি তাঁকে অত্যন্ত আশা করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল বিশ্বভারতীর নতুন সায়ান্স ল্যাবরেটরির উদ্বোধন করাবেন সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়ে।

১৩৪৮ সালের ২৫শে বৈশাখ (ইং ১৯৪১) কবির জন্মোৎসবে যোগ দেবার জন্যে ২৪শে বৈশাখ বিকেলের গাড়িতে অধ্যাপক বোস তাঁর এক

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে কবি সন্দর্শনে যাত্রা করলেন। শ্রীযুক্তা মহলানবিশ লিখেছেন, '...... ২৫ শে বৈশাখের উৎসবে আমরা যাচ্ছি শুনে যখন সত্যেনবাবুও আমাদের সঙ্গী হতে চাইলেন, তখন ভাবলাম কবির জন্মদিনে তাঁকে সত্যিই খুশি করে দিতে পারবো এই অপ্রত্যাশিত অতিথি-টিকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে—'

ঠিক তাই হলো। সত্যেন্দ্রনাথ কবিকে প্রণাম করতেই একগাল হেসে বললেন, 'কই হে, তোমাকে তো মোটে পাওয়াই যায় না। ভেবেছিলুম দোলের সময় পাবো এবং তোমাকে দিয়ে খাটিয়ে নেবো; তা ঠিক সেই সময়েই আবার হিন্দু মুসলমানে মাথা ভাঙাভাঙি শুরু করে দিল। যাক্, এসেছ যে সেজন্যে বড়ো খুশি হয়েছি। শরীরটাকে নিয়ে আজকাল কিরকম বন্দী হয়ে পড়েছি; তোমরা এলে-টেলে একটু গল্প সল্প করি, ভালো লাগে, এই যা। তোমার প্রমথ (সেনগুপ্ত) খুব খুশি হবে। তাদের নতুন ল্যাবরেটারিটা একবার দেখে এসো। ......এখন কয়েকদিন থাকবে তো?'

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর মেয়েকে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর কবি তাকে বলেছিলেন, 'সব ঘুরে টুরে দেখে নাও। একটি সঙ্গী জুটিয়ে ফেল, তাহলে সুবিধে হবে। তুমি এখানে থেকে যাও না? বাবাকে বলো ভর্তি করে দিতে।'

সত্যেন্দ্রনাথ চা খেতে চলে গেলে কবি শ্রীযুক্তা মহলানবিশকে আবার বললেন, 'রাণী, তোমাদের বন্ধুর যত্নের ভার তোমার উপর দিয়ে কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত রইলুম। তুমি লক্ষীটি, একটু ভালো করে ওর দেখাশোনা কোরো, বেচারা ভালোমানুষ এখানে যেন কষ্ট না পায়। সত্যেনকে আমার ভারী ভালো লাগে।'

এই ভালো লাগা বিজ্ঞানকেই ভালো লাগা। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় ঋষিতুল্য—ক্রমশ সবিতৃমণ্ডলের দিকে অগ্রসরমান। সপ্তাশ্ববাহিত রথে আরোহণ করে তিনি চলেছেন। মধ্যাহ্ন-সূর্যকে সস্নেহ আহ্বান জানাচ্ছেন চলমান রবি। রবি অস্তপ্রায়—তার আভায় তখন সাহিত্যাকাশ আরক্তিম। কবি কণ্ঠ নিস্তব্ধ প্রায়—তাঁর সঙ্গীত তখন মানুষের মনে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করছে। ধীরে ধীরে ভারতের আকাশে জেগে উঠছে বিজ্ঞান সূর্য। কবি তাই কামনা করেছেন। কবি

দেখেছেন জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রকে ; জেনেছেন রামানুজ-রমনকে। আশান্বিত হয়েছেন। প্রত্যক্ষ করলেন জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি সমুদ্র মথিত হয়ে ওঠা এক আশ্চর্য প্রতিভাধরকে—তিনি সত্যেন্দ্রনাথ। সেই তরুণ প্রতিভা ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো। বিদেশের বিজ্ঞানসভায় তিনি ভারতের প্রতিভূ। কবি সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন প্রতিটি পদক্ষেপ। তাই তিনি তাঁর জীবনের বাস্তব চেতনার শ্রেষ্ঠ ফসল 'বিশ্বপরিচয়' উৎসর্গ করলেন সত্যেন্দ্রনাথের করকমলে। অস্তপ্রায় রবি মধ্যাহ্ন তপনের দীপ্তি প্রত্যক্ষ করে তৃপ্তি পেলেন—এবার 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

মাত্র এই তিন জনই নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকালে বহু বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। বিশ্বখ্যাত সাংখ্যিক অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কবির অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এমন কি তিনি কিছুদিন বিশ্বভারতীর যুগ্ম-কর্মসচিবও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী হয়ে তাঁর সঙ্গে বিদেশের নানাস্থানে ঘুরেছেন। একই সঙ্গে উল্লেখ করবো ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বোসের কথা। পদার্থবিদ্যার খ্যাতিমান অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বিদেশেও কীর্তি অর্জন করেছেন। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় এবং বর্তমানে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথিতযশা ডিরেক্টর। তিনিও রবীন্দ্রনাথের অতি সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর কোষাধ্যক্ষ। খ্যাতনামা চিকিৎসাবিজ্ঞানী সার নীলরতন সরকারও কবির অন্তরঙ্গের মধ্যে।

বিঃ দ্রঃ কবি ও সত্যেন্দ্রনাথের সাক্ষাতকারের বিবরণ নির্মল কুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত।

শেষপর্ব

বিজ্ঞানের যুগে সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে বারবার কবির মনে প্রশ্ন উঠেছে, আত্ম জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হয়েছে—বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের তফাৎ কোথায়। জিজ্ঞাসা হলো বিজ্ঞানের যুগে সাহিত্যিকদের কর্তব্য কি ?

বিদেশে এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন কবি সাহিত্যিকেরা। দেখা গেছে তাঁদের কথার মধ্যে 'জোর' যতটা আছে, যুক্তি ততটা নেই। প্রথম দিকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা ছিল তার ক্রমশ পরিবর্তন হয়েছে তাও লক্ষ্য করবার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাহিত্যের মধ্যে থাকে মানুষের হৃদয়ের আবিষ্কার চিহ্ন। তার মধ্যে ঘটে মানব হৃদয়ের প্রকাশ। বাইরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আর একটা জগৎ হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে যে কেবল বাইরের জগতের রঙ, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাই নয়, তার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিশ্বাস, আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্ররসে নানাভাবে আভাসিত হয়ে উঠছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিত করে তুলে আমরা বহির্জগতকে বিশেষরূপে আপনার করে নিই। বিজ্ঞান সম্পর্কে কবি বলেছিলেন, 'বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়।' [৫২]

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ক্ষমতার প্রবলতা সাহিত্যের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে এমন আশঙ্কা হয় তো কবির মনে কখনো জেগেছিল। এককালে শাস্ত্রশাসন য়ুরোপের বিজ্ঞানকে করে রেখেছিল পঙ্গু। কে জানে বিজ্ঞান সেই ভূমিকায় এখন অবতীর্ণ হবে কি না। কবি বলেছেন মধ্যযুগে একসময়ে য়ুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। সেই শাসন তখন বিজ্ঞানকে অভিভূত

৫২ সাহিত্যের পথে (১৩৫৬ সং) পৃ ৭

করেছে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে একথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলে গিয়েছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আধিপত্য মেনে নিতেই হবে—তার সিংহাসন ধর্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজ তার বিপরীত হলো। বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে প্রবল। কোথাও নিজের সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানবমনের প্রতি বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে।

বিজ্ঞানের সম্পর্কে কবি বলছেন যে তা হলো ব্যক্তিস্বভাববর্জিত। তার ধর্ম হলো সত্য সম্পর্কে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল সাহিত্যকেও ঘিরে ধরেছে। সাহিত্যের ধর্ম অন্যরূপ। পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে সাহিত্যের ধর্ম। তার বাণী হলো স্বয়ংবরা।

ক্রমশ কবির ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত 'রবীন্দ্রজীবনী'র ৩য় খণ্ডে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে অভ্যুদয় হলো নতুন যুগের। তখনকার লেখকের রচনায় পাঠকের মনে মোহ সঞ্চার করতো। কাব্যে যে রস সৃষ্টি হতো, তা আধুনিকদের মতে অবাস্তব। যেহেতু সে যুগে বিষয় থেকে বিষয়ী হতো বড়ো। আগে কাব্যের যে মোহ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতো তার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানের যুগের পূর্বেকার অনেক অজ্ঞানতাপ্রসূত তত্ত্ব মানুষের মন থেকে চলে গেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মোহ দূর হয়েছে অনেকাংশে।

বিজ্ঞানের আতিশয্যে যন্ত্রযুগে আজ আধুনিকদের দল জীবিকার্জনের উৎকণ্ঠায় অবকাশহীন। প্রতিটি কার্যে ব্যস্ততা, সকলেরই সময়ের অভাব। তাই কাব্য ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের এই প্রভাবকে মেনে নিয়েছেন। বলেছেন, 'এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য ব্যবস্থায় যে ব্যয় সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে, ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে।'

কবি আরও বলেছেন, 'আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।'

নিরাসক্তি বিজ্ঞানের বড়ো কথা। আসক্তি বিহীন কৌতূহল তার ধর্ম। সাহিত্যে সেই নিরাসক্তি ভাব থাকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন কবি।

শিল্প বা কলার যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা বলেন আগে শিল্প পরে বিজ্ঞান। মানুষের জন্মের প্রথম অধ্যায় থেকেই শুরু হয়েছে শিল্পের রথযাত্রা। কালক্রমে তার ব্যাপ্তি ঘটেছে নানা দিকে, আর বিজ্ঞান তো আধুনিক কালের সৃষ্টি এ কথা অনেক শিক্ষিতের কণ্ঠে শোনা যায়। নিঃসন্দেহে এটি ভ্রান্তি। বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে যে ইতিহাসের সূচনা হয় তা নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞানের। এ কথা অনস্বীকার্য যে আদি মানবের শিল্পকলাপ্রীতি যতটা ছিল, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তার চেয়ে কম ছিল বলে মনে হয় না। বরং বিজ্ঞানবুদ্ধি অধিক-মাত্রায় বর্তমান ছিল তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারি যে কাব্যের শুরু হয় প্রকৃতি বন্দনা দিয়ে। শিল্পেরও আরম্ভ সেখানেই। আর ঐ প্রকৃতি বন্দনার মূলে রয়েছে প্রকৃতি বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সাহিত্যে, কারুশিল্পে বিজ্ঞানের বিপুল প্রভাব দেখে বিস্মিত হই। প্রকৃতপক্ষে এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই, যেহেতু মানুষের আদিমতম যুগ থেকে বিজ্ঞান ও শিল্পের সঙ্গে এক বিচিত্র সখ্যতার বন্ধন চলে আসছে। এই গাঁটছড়াকে আমরা অস্বীকার করে এসেছি, তাই সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানের কারুকার্য দেখলে চমকে উঠি। যে সাহিত্যিক বা কবির কৃতকর্ম কালোত্তর, নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হবে যে তিনি বৈজ্ঞানিকের মত সত্যনিষ্ঠ।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। বহু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো অমর হবার সৌভাগ্য হয়েছে ক'জনার? এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এই যে কবির অন্তরে বিজ্ঞানীর সত্যনিষ্ঠা যতটা ছিল হয়তো অনেকেরই তা ছিল না। তাই তিনি বেঁচে থাকবেন মানুষের মনের মণিকোঠায়। আমাদের দেশে কেন, বিদেশেও এমন একটা যুগ প্রবাহিত হয়ে গেছে যখন দেশের শিল্প-সাহিত্যের কর্মে নিযুক্ত কর্তারা বিজ্ঞানের প্রভাবকে বিন্দুমাত্র স্বীকার করতে অত্যন্ত অনীহা প্রকাশ করতেন। আর আমাদের দেশের তো কথাই নেই। সেই কতযুগ আগে ভারতঋষিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দীপশিখা জ্বেলেছিলেন তাকে তেল-সল্‌তে দিয়ে উজ্জ্বলতর করবার কোন চেষ্টা আমরা করি নি। আর তা করি নি বলেই দীর্ঘদিন অজ্ঞানের প্রচ্ছায়াতে নিশ্চেষ্টচিত্তে অলসতার অনুশীলন করে এসেছি। রবীন্দ্রনাথের আগে এমন কোন কবির সন্ধান পাওয়া যায়

কি না সন্দেহ—যিনি বিজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে নিজের চক্ষু উন্মীলন করতে পেরেছিলেন। যে সব কবি-সাহিত্যিকের অন্তর বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে আলোকিত হয় নি, তাঁদের রচনাবলী কখনই কালজয়ী হতে পারে নি। অনেক সময়েই তাঁদের বল্গাহীন কল্পনা উদ্দাম হয়ে বিপথগামী হয়েছে। ইংরেজ কবি পোপ তাঁর রচনাতে বিজ্ঞান-বিমুখ কবি-সাহিত্যিকদের বিদ্রূপাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছেন।

আর একটা কথা বিশেষভাবে চিন্তা করবার সময় এসেছে অবৈজ্ঞানিক মন নিয়ে কাব্য রচনা করলে কোন কবি মহাকবির আসন পেতে পারেন কিনা। যাঁরা মনে করেন কল্পনার ফানুস উড়িয়ে দিলেই কাব্য হয়, যুক্তিহীন বক্তব্য পেশ করলেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তাঁরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছেন তা অনুমান করা চলে একথা অনেকে বলেছেন। অযৌক্তিক কথা, অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য কবির মুখে শোভা পাওয়া উচিত নয়, মহাকবির পক্ষে তো নয়ই।

কেবলমাত্র আজগুবি কথা বা রসাত্মক বাক্য দিয়ে কাব্য সৃষ্টি হয় না, যা সৃষ্টি হয় তা হলো ফ্যান্সি বা ইমাজিনেশন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের সংজ্ঞা বলেছেন—'রসাত্মক বাক্য যখন সত্যাত্মক হয় তখনই তা সত্যিকারের কাব্য।'

বিজ্ঞানের মধ্যে দুটি স্তর আছে। একটি রূঢ় আর একটি কোমল। প্রথমটি প্রয়োগ বিজ্ঞান তথা যন্ত্রবিজ্ঞান। এর সাহায্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতিবাস্তব প্রয়োজনের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। আর একটি কোমল তথা শৌখিন পর্যায়ের। প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় দাবি মেটাবার দায়মুক্ত হয়ে বিশ্বের অসীম রহস্য উদ্ঘাটনে উন্মুখ। তাঁরা নিঃসন্দেহে কল্পনাপ্রবণ। তা না হলে মহামতি গ্যালিলিও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নক্ষত্রলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন না। নিউটন, গ্যালিলিও, ডালটন, রাদারফোর্ড, হার্টন, ম্যাক্সওয়েল, ফ্যারাডে, আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক প্রভৃতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করার অধিকারী গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ। সকলেই কল্পনারাজ্যের অধিবাসী। বিশ্বরহস্য উন্মোচনে উভয় দলের সত্যনিষ্ঠা সমশ্রেণীর, পার্থক্য কেবল মাত্র প্রয়োগ কর্মে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের কোন সম্পর্ক বিদ্যমান কি না তা নিয়ে প্লেটো,

কান্ট, হেগেল, স্পিনোজা থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে আসছে। যোজনব্যাপী পার্থক্যটা যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এর কারণ স্বরূপ বলেছেন, 'কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে।'

প্রস্তর যুগের শেষাংশে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য গেল অনেক বেড়ে। সর্বক্ষেত্রে বিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল। মিশর, ব্যাবিলন, চীনে বিজ্ঞানের প্রভাবজনিত বিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যায়। সভ্যতা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে লাগলো। তাতে স্পর্শ লাগলো ধ্রুপদীয়ানার ঔজ্জ্বল্য। বিজ্ঞান ও শিল্প তার উপচ্ছায়াতে পড়ে গেল। গ্রীসে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণা শুরু হলো। ধর্মের অনুশাসনের চাপে এখানে বিজ্ঞানের দীপশিখা নিবু নিবু হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কাব্যে-সাহিত্যে ঈশ্বর তত্ত্ব, কৌতুক-প্রহসন আর অবাস্তব কল্পনার ছড়াছড়ি ছিল। রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে কাব্যে-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজের রং ধরলো।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন বা বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখেছেন তার জন্যেই তাঁকে বিজ্ঞানের অনুপন্থী বলছি না, কবির সমগ্র জীবনের বিস্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম তার প্রমাণ। তিনি পেশায় বিজ্ঞানী নন কিন্তু মেজাজে পুরোপুরি। মানসী কাব্যের মধ্যে কবি যখন পরিপূর্ণ সচেতনভাবে তাকিয়েছেন বিশ্বের দিকে তখন তাকে মনে হয়েছে ভয়ঙ্করী। তারই পর-মুহূর্তে 'অহল্যার প্রতি' কবিতার স্নিগ্ধ প্রলেপে চিত্ত শান্ত হয়ে আসে।

মানবের সামাজিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'মানবের সামাজিক জগৎ হ্যলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের বহু বিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য এবং আরও কত কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন।'[৫৩]

কেবলমাত্র তত্ত্বীয় বিজ্ঞান আলোচনা নয়, বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধেও তিনি অচেতন ছিলেন না। মাটি খাদ্যাভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে এবং তার জন্য ফসল ভাল হচ্ছে না এদিকটাও কবির নজর এড়িয়ে যায় নি। ১৯৩০ সালে

---

৫৩ প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪১ : সাহিত্যতত্ত্ব

রাশিয়া থেকে ঘুরে আসার পর এক বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারের গতি চক্রপথে মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। মাটিতে ফসল লাগানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে। গাছপালা, জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ পাচ্ছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে।' বক্তৃতাটি খুব সম্ভবতঃ ১৯৩২ সালে দেওয়া। রাশিয়াতে কৃষিবিজ্ঞানের উৎকর্ষ দেখে কবির এ ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছিল তাও মনে করা যেতে পারে। কবির বক্তৃতায় 'নাইট্রোজেন চক্রে'র কথা বলা হয়েছে।

কবি হয়তো এঙ্গেলসের 'ডায়ালেকটিকস্ অব নেচার' পড়েন নি। কিন্তু নরবানর থেকে আজকের এই মানুষের রূপান্তর গ্রহণে সামাজিক শ্রমের ভূমিকা সম্বন্ধে এঙ্গেলস্ যা বলেছেন, কবিও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

'দেহের দিক হইতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সেইখানে—যেখানে সে দুই পদের উপর ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি আহরণ করিল।...দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে।

পায়ের কাছ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তাহলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মতো অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন এক বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নবস্ত্রের নয়, যাকে বলা হয় বিজ্ঞানব্রহ্ম, আনন্দ-ব্রহ্মের রাজ্য।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে কবি অনেকসময় সমাজের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত নিয়েছেন। পরমাণুর কেন্দ্রের মধ্যে হাঁ-ধর্মী প্রোটন এবং না-ধর্মী নিউট্রনকে যে অতি প্রবল এক শক্তি ঘরের বিবাদ মিটিয়ে একসূত্রে বেঁধে রেখে বিশ্বের ভাঙনকে রক্ষা করেছে তা বোঝানোর জন্যে কবি প্রাক্-বিপ্লব মহাচীনের ইতিহাস থেকে উপমা দিয়ে বলেছিলেন, 'চীন রিপাব্লিকের শান্তি নষ্ট করে কতকগুলি একাধিপত্য-লোলুপ জাঁদরেল পরস্পর লড়াই

করে দেশটা ছারখার করে দিচ্ছিল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই বিরুদ্ধ দলের চেয়ে প্রবলতর শক্তি যদি থাকত তাহলে শাসনের কাজে এদের সকলকে এক করে রাষ্ট্রশক্তিকে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ ক'রে রাখা সহজ হত। পরমাণুর রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই বড়ো শক্তি আছে সকল শক্তির ওপরে, তাই যারা স্বভাবত মেলে না তারাও মিলে বিশ্বশান্তি রক্ষা হচ্ছে। এর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের শান্তি পদার্থটি ভালোমানুষী শান্তি নয়।······যারা স্বতন্ত্রভাবে সর্বনেশে তারাই মিলিত ভাবে সৃষ্টির বাহন।'

'রাশিয়ার চিঠি'তে (১৩৩৮) কবি বিপ্লবতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ভাষায়। বলশেভিকবাদের অভ্যুদয়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন, 'বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব (depression) ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ছুটে আসে এও সেই রকম কাণ্ড। মানব সমাজে সামঞ্জস্য ভেঙ্গে গিয়েছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব।'

জগতের সমস্ত পদার্থই গতিশীল আর সেই গতির মূলে আছে মহাকর্ষ শক্তি। এ সম্বন্ধে কবি বলছেন 'নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে।'

বিশ্বপ্রকৃতির চক্রবর্তন গতি বোঝাবার জন্য কবি যে উপমা দিয়েছেন তা সত্যই অপূর্ব।

'ফুল যখন ফুটিয়া ওঠে মনে হয় ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্যমাত্র সেকথা গোপন থাকে।···আবার ফলকে দেখিলে মনে হয় সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, একথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।'

রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক মেজাজের একথা বহুবার বলা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক মন গড়ে উঠবার পশ্চাতে ছিল নানা ঐতিহ্য। মানুষের পরে ঐতিহ্য (Heridity) এবং পরিবেশের (circumstance) প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্যাভ্‌লভের বস্তুবাদী মতকে সমর্থন করে। কবি বলেছেন, 'একটি মানুষের মনের পিছনে আছে অসংখ্য সংস্কার—বংশগত, সমাজগত, জাতিগত, ভাষাগত বিচিত্র উপাদানে গঠিত। জৈব ও ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক বিভিন্ন কার্যকারণ পরম্পরা গঠিত মানবের এই দেহ ও মন। তাহার ব্যক্তিপুরুষ সৃজিত হইতেছে এই বিচিত্র উপকরণের ঘাত প্রতিঘাতে। এই সবের ভার মানুষ যুগযুগান্ত ধরিয়া বহন করিয়া আসিতেছে এবং পারিপার্শ্বিকের নিত্য প্রভাব ও সাহচর্য নব নব পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া মানুষকে জটিল জীবরূপে গড়িতেছে।'

কবি হয়তো আদর্শবাদী ছিলেন কিন্তু তাঁর আদর্শবাদ বিজ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে নয়, বাস্তব জগৎকে উপেক্ষা ক'রে নয়। তিনি বলেছেন: সৃষ্টি আছে প্রত্যক্ষ, সেই সৃষ্টির একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যক্ষ।...সৃষ্টের উপরে অসৃষ্টের স্পর্শ নামে সেইখানেই, আকাশ থেকে পৃথিবীতে যেমন নামে আলোক।...ব্যক্তের বীণাযন্ত্রে আপন বাণী পাঠায় অব্যক্ত।...সংসারের নিয়মকে জেনেছি...মূঢ়ের মত তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত ক'রে দেখি নি কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে।

তাহলে একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে কবির আদর্শবাদ বিজ্ঞানকে উপেক্ষা ক'রে নয়, বরং তাকে স্বীকার ক'রেই। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্বকে উপলব্ধি করবার প্রচেষ্টা তাঁর আবাল্য।

১৯৩৩ সালে রচিত 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন বিজ্ঞানবুদ্ধিকে। মানুষের বিবর্তন তো কেবলমাত্র বাইরেকার ব্যাপার নয়, সংস্কৃতিগত অর্থাৎ অন্তরের দোরগোড়াটা পর্যন্ত নাড়া দিয়ে যায়। অভিব্যক্তি বা বিবর্তনবাদের ধারা দেখতে গেলে শুধু দেহের দিকে তাকালেই হয় না, তাকাতে হবে মনের দিকে। দৈহিক ও প্রাণগত বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক এবং সামাজিক দিকের বিবর্তন কতটা হয়েছে তাও লক্ষ্য করতে হবে। জুলিয়ান হাক্সলী এই মত পোষণ করেন এবং আধুনিক প্রাণীতত্ত্ববিদ বা অভিব্যক্তিবাদের বিজ্ঞানীরাও এই মত স্বীকার করেন। মানুষ তো গাছ বা জন্তুর মত কালের হাতের ক্রীড়নক নয় আবার যান্ত্রিক পুতুলও নয়। নানা পরিবেশ তার মনে নানাধরনের প্রভাব বিস্তার করে। এ সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টি-ব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল।'

মানুষ একদিকে একক আবার অন্যদিকে সে বহুধা বিভক্ত। মানব দেহের জীবকোষের জন্মমৃত্যুর কথা কবি অপূর্বভাবে বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে —'মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অণুবীক্ষণ যোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারিদিকে ফাঁক। একদিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর একদিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ, সেই প্রেরণা সমগ্রদেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরমরহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন।'

'পূরবী' গ্রন্থের 'তপোভঙ্গ' কবিতায় এই তত্ত্বটির শিল্পরূপ প্রকাশ পেয়েছে। সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি বোঝাবার জন্য কবি সুন্দর উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, 'একখণ্ড লোহার রহস্যভেদ করে বৈজ্ঞানিক বলেছেন, সেই টুকরোটি আর কিছুই নয়, কতকগুলি বিশেষ ছন্দের বিদ্যুৎ মণ্ডলীর চিরচঞ্চলতা। সেই মণ্ডলীর তড়িৎকণাগুলি নিজেদের আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে সহজ দৃষ্টিতে যদি সেই রকম দেখা যেত, তাহলে মানবমণ্ডলীতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন পৃথক দেখি তেমনি তাদের দেখতুম। এই অণুগুলি যত পৃথকই হোক এদের মধ্যে একটা শক্তি কাজ করছে। তাকে শক্তিই বলা যাক। আমরা যখন লোহা দেখছি তখন বিদ্যুৎকণা দেখছি নে, দেখছি সংঘরূপকে।' (মানুষের ধর্ম)

উপনিষদের নানা তত্ত্বকে বিজ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চেষ্টা করেছেন তিনি। মাধ্যাকর্ষণ ব্যাপারটিকে খুবই সরলভাবে হাজির করা হয়েছে। বলেছেন 'উপর থেকে নীচে পড়ল একটা পাথর। দেউড়িতে যে দ্বারী থাকে সে খবর দিল, এই যে পড়েছে। নীচের দিকে উপরের বস্তুর যে-টান

সেইটে ঘটল। দ্বারীর কর্তব্য শেষ হল। ভিতর মহল থেকে শোনা গেল একে টান, ওকে টান, তাকে টান, বারে বারে 'এই-যে'। কিন্তু 'এই যে'-কে পেরিয়ে বিশ্বজোড়া একমাত্র টান। উপনিষদ সকলের মধ্যে এই এককে জানাই বলেন 'প্রতিবোধবিদিতম'। (মানুষের ধর্ম)

মানুষের স্বভাব অনির্দিষ্টের দিকে ঝুঁকে পড়া। প্রকৃতি তাকে যে আবর্তনের পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা সে সব সময় মেনে চলতে চায় না। অজ্ঞাত, অচেনা জগতের দিকে তার আকর্ষণ হয়ে ওঠে প্রবল। মানুষ নিজের কল্পনাতে সৃষ্টি করেছে দেবলোক। সে হঠাৎ ভাবাবেগে বলল, দেবলোক থেকে এই আদেশ এসেছে, সেই হুকুম অমান্য করবার জো নেই। মানুষ বলছে দেবলোক আমাদের আকর্ষণ করছে কিন্তু সেই দেবলোকের দেবতার অস্তিত্ব নিয়ে তাদের মধ্যেই আবার দ্বন্দ্ব চলছে। এই অদৃশ্য শক্তিমান বস্তুটি যাই হোন না কেন, তিনি মানুষকে স্থির থাকতে দিচ্ছেন না। এই আকর্ষণের সত্যটি রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন বিজ্ঞানের উপমার সাহায্য নিয়ে। 'জ্যোতির্বিদ দেখলেন, কোনো গ্রহ আপন কক্ষ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহ-মনে বললেন, অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েছে। দেখা গেল, মানুষেরও মন আপন প্রকৃতিনির্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথ আবৃত্তি ক'রে চলছে না। অনির্দিষ্টের দিকে, স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকছে।'

মানবমনের বিচিত্র ভাবের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন ধরনের 'আমি' আছে। এক হচ্ছে 'ছোট আমি' বা 'ব্যক্তিগত আমি' আর একটি হচ্ছে 'বড় আমি' আমাদের চেতনাকে মহত্তর পথের দিকে টেনে নিয়ে যায়। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ত্যাগে আর ওরই পাশে যে 'ছোট আমি' আছে সে চায় সঞ্চয় করতে। দুই বিপরীত সত্তা আমাদের ভিতরে নিরন্তর তাদের প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে। এক সত্তার টানে আমরা পার্থিব ধনসম্পদ ক্রমাগত সঞ্চয় করে চলেছি, ঠিক তারই বিরোধী সত্তার প্রভাবে ত্যাগ করতে যাচ্ছি সঞ্চিত বস্তুকে। এই দুই ধরনের বেগ জ্যোতির্লোকেও বর্তমান। এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বলেছেন, পৃথিবী আপনাতে আপনি আবর্তিত, আবার বৃহৎ কক্ষপথে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। মানুষের সমাজেও যা কিছু চলছে সেও এই দুই রকমের বেগে। একদিকে 'ব্যক্তিগত আমি'-র টানে ধনসম্পদ প্রভুত্বের

আয়োজন পুঞ্জিত হয়ে উঠছে, আর একদিকে অমিত মানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তাঁর কর্মের যোগ, তাঁর আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশ্য ত্যাগ। (মানুষের ধর্ম)

মানুষ এক সময় ছিল বর্বর, তার জীবন ছিল পশুর মতো, তখন কেবলমাত্র 'ভৌতিক জীবনের' সীমায় তার কর্ম আবদ্ধ থাকতো। ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল ধী-শক্তি তার তমসাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে—চৈতন্যে রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে। কবি রজ্জবের একটা বাণী আছে। তিনি বলেছেন,

"সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও একদিন তাঁর উপলব্ধির কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে গিয়েছিলেন বলেই চরম বিপদের মধ্যে যেতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবল শত্রুর কাছে মাথা নত করতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সত্য কখনো চাপা থাকে না। এ সম্বন্ধে কবি লিখেছেন, 'একদা যেদিন কোনো একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক বললেন, পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘুরছে, সেদিন সেই একজন মাত্র মানুষই বিশ্বমানুষের বুদ্ধিকে প্রকাশ করেছেন। সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় ক্রুদ্ধ; তারা ভয় দেখিয়ে জোর করে বলাতে চেয়েছে, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে; তাদের সংখ্যা যতই বেশি হোক, তাদের গায়ের জোর যতই থাক্, তবু তারা প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করবামাত্র চিরকালের মানবকে অস্বীকার করল। সেদিন অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে কে বলতে পেরেছে সোঽহং, অর্থাৎ আমার জ্ঞান আর মানবভূমার জ্ঞান এক—তিনিই বলেছেন যাঁকে সেদিন বিপুল জনসংঘ সত্য প্রত্যাখ্যান করাবার জন্যে প্রাণান্তিক পীড়ন করেছিল।'

কবির জীবন যখন সমাপ্তির দিকে তখন রচিত হলো 'সে' গ্রন্থ (১৩৪৪)। অদ্ভুত ধরণের গল্প দিয়ে তৈরী হয়েছে বইখানি। এর মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মনস্কতার আশ্চর্য ছবি। তার আগে বিজ্ঞানের রাজ্যে নানা চিন্তাধারার সংযোজন হয়েছে। পুরোনো অনেক তত্ত্ব পরিবর্তিত হয়েছে। কবি বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কবি বা দার্শনিক নয়, বিজ্ঞানীই যে কবির আজকের প্রিয়তম তার সাক্ষ্য মেলে 'সে' এবং

'গল্পসল্প' বইতে। সৃষ্টি তথা বিবর্তনের তত্ত্বসমূহ, প্রজনন তত্ত্ব, মহাকাশ যাত্রার অনুশীলন, শারীর বিদ্যার আধুনিক আবিষ্কার, আলোর আধুনিকতম পর্যবেক্ষণ 'সে' গ্রন্থের ফ্যান্সী-জাতীয় গল্পের অন্যতম উপজীব্য বস্তু। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'সে' গ্রন্থটি বুঝিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবি ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিশ্বপরিচয় মনের মধ্যে জাগ্রত রাখা প্রয়োজন। ছবির সঙ্গে 'সে'র সম্বন্ধটা স্পষ্টতর। বিশ্বপরিচয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে হুঁহাউ দ্বীপের কাহিনীটিতে। (বিশ্বপরিচয় ২য় অনু)। বৈজ্ঞানিক সত্যকে আশ্রয় করিয়া বালকের উপভোগ্য কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম নয়, আগেও আছে, এই শেষ নয়, পরেও আছে, 'গল্পসল্প' গ্রন্থে।'[৫৪]

'সুকুমার' ('সে') বালকটির মধ্যে পরবর্তী অধ্যায়ে লিখিত 'তিন সঙ্গী' গল্প গ্রন্থের 'রবিবারে'র অভীককুমারের পূর্বগামিনী ছায়া নিক্ষিপ্ত হয়েছে বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দুজনেই ছিল চিত্রকর। পরে দুজনেই এঞ্জিনীয়ার হবার উদ্দেশ্যে বিলেত রওনা হয়েছে।

'বৈজ্ঞানিক রসিকতা' করতেও কবি ক্রমশঃ পারদর্শী হয়ে উঠছেন।

'দ্বৈপায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগ্‌নি পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন। সকাল বেলায় ডান নাকে, মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে; সায়াহ্নে দুই নাকে একসঙ্গে, সেইটেই বড়ো ভোজ।'

'নয়' নম্বর গল্পে আবার বৈজ্ঞানিক রসিকতা। মগজ বদল করার পরীক্ষার কথা বলেছেন রসিয়ে রসিয়ে।

হাড়ের কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচারের কথাও তিনি স্থান দিয়েছেন তাঁর কাব্যে।

যথা—ডাণ্ডা
ধপাৎ
ঠাণ্ডা
কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার।

'তেরো নম্বর' গল্পে কবির লেখনীতে পৃথিবী সৃষ্টি এবং মানুষের আগমনের কাহিনী শোনাচ্ছেন। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে গল্পচ্ছলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে

---

৫৪ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—প্রমথনাথ বিশী।

প্রকাশ করা যে কত মুন্সীয়ানার কাজ তা হয়তো অনেকের জানা নেই। যাই হোক কবির রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেই :

'পৃথিবী সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারি ভারি জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আব্রুতা ছিল বহু যুগ ধ'রে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার যেন লজ্জা রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল স্তূপাকার হাড়মাংসের বোঝাই নিয়ে; মোটা মোটা বর্ম পরে তারা দুশো পাঁচশো মোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুল্য গেল ঘুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ত্বকে। না রইল শিঙ, না রইল ক্ষুর, না রইল নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটি মাত্র পায়ে। বোঝা গেল বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন সৃষ্টির যুগটাকে ক্রমশ সূক্ষ্ম করে আনবার জন্যে। স্থূলে সূক্ষ্মে জড়িয়ে আছে মানুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলছে ঠেলাঠেলি মারামারি। বিধাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উঁহু হল না। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এটাও টিকবে না; এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে ঝরে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে।'

পৃথিবীতে তিন রাজ্য। এক সমুদ্র তলে, আর এক ভূতলে, 'আর আছে আকাশে যেখানে সূক্ষ্ম হাওয়া আর সূক্ষ্মতর আলো। এই খানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্যে।'

কবির এ কল্পনা আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। মহাকাশযাত্রা আজ অলীক বস্তু নয়।

পদার্থ-বিদ্যার গল্পও বলেছেন তিনি।

'তোমাদের বিজ্ঞান-মাষ্টার তো সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বজগতে সূক্ষ্ম আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্থূল রূপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম সূক্ষ্মরূপেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে তোমরা সবাই আলো করে বসবে। সে দিন ওটিন-স্লো-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলি হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন্ রঙের আলো হব, দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি ?

আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো ? ইলেকট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইট্স্এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেকট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্ছি।'

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, নিউট্রন দিয়ে পরমাণু ভাঙা ইত্যাদির কথা হয়তো কবি বলতে চেয়েছেন।

'মেরুজ্যোতি'র কথাও কবির অজানা নয়। রাত্রির তমসা বিদীর্ণ ক'রে আকাশের বুকে জেগে ওঠে আলোর রঙমশাল। কেঁপে কেঁপে ওঠে তার আলো। দীপ্ত করে তোলে নৈশগগন। লোহিত, সবুজ, নীল আর সাদা এই চার রঙের হোলিখেলা। মনে হয়, রঙিন আলোর ঝালরে কে যেন মুড়ে দিয়েছে আকাশের ঐ প্রান্তসীমা থেকে শুরু করে যতদূর দৃষ্টি চলে। বিজ্ঞানীরা এই আলোক প্রভার নাম দিয়েছেন মেরুপ্রভা বা মেরুজ্যোতি। ইংরেজিতে 'অরোরা'। উত্তরে এর নাম অরোরা বোরেলিস আর দক্ষিণে অরোরা অস্ট্রেলিস্। একদল বিজ্ঞানী মনে করেন ৫৩° অক্ষাংশের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে নিশীথের মধ্যযামে দেখা যায় মেরুজ্যোতি। আবার অনেকে বলেন পৃথিবীর চৌম্বক অক্ষরেখার (Magnetic axis) মেরুপ্রান্ত থেকে ২০-২৫ ডিগ্রীর মধ্যে অরোরার স্থায়ী বাসস্থান। আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বর্ষ সংস্থার তথ্য-সংগ্রহ বিভাগের ডঃ জি. স্প্রেস্ এবং কার্ল-ডব্লু গার্টলেন অনুমান করেন যে প্রতিটি মেরুর ২০,০০০ মাইল উর্ধ্বে দুটি বিকিরণ বলয়রেখা বর্তমান। তাঁরা বলেন, ভূ-বিষুবীয় বলয় এবং এই দুই বলয়ের মাঝখানে উঁকি দেয় মেরুজ্যোতি।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, সূর্য থেকে অতি তীব্রগতিতে (সেকেণ্ডে ১৫০০ মাইল বেগে) ছুটে আসে হাইড্রোজেন আয়ন অথবা প্রোটন। এই

প্রোটন তাদের সঙ্গে আকর্ষণ করে টেনে নেয় ইলেকট্রনগুচ্ছ। এদের মধ্যে কিছু অংশ পৃথিবীতে পৌঁছে যায় আর পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র বিচ্ছিন্ন করে দেয় ইলেকট্রন-প্রোটনের জুটি। ফলে এই গ্রহের অতি নিকটে সৃষ্ট হয় এক বিকিরণ বলয়। যখন বেশ কিছু সংখ্যক প্রোটন প্রবেশ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে, সেখানে তারা তাদের অঙ্গ থেকে নির্গত করে আলোকপুঞ্জ। অনেকে মনে করেন যে এক বিশেষ "সংরক্ষণ পদ্ধতির" জন্যে সৃষ্টি হয় নাইট্রোজেন অণুর ঝাঁক। এদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয় নীলকান্তি আলো। 'সে' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দেবার প্রাক্কালে মেরু-জ্যোতি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানের প্রয়োজন। 'সে' গ্রন্থে আছে—

'গান হবে রঙের সঙ্গত। বড় সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে অরোরা বোরিয়ালিস্ বানিয়ে দেবে।

আর তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলো তো।

তাতে লোহার ইলেক্‌ট্রনও মিশবে আবার সোনারও।'

সূর্যালোকের বর্ণালীতে আদি এবং অন্তে দু'জায়গাতেই বেশ খানিকটা অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ণালীর সাতটা রঙের এ মাথায় বেগুনী আর শেষে লাল। বর্ণালীর যে অংশ বেগুনীর সীমা পেরিয়ে যায় তাকে বলা হয় আলট্রাভায়োলেট বা অতি-বেগুনী অথবা বেগুনীপারের আলো। আর লাল ছাড়িয়ে যে অদৃশ্য আলোর স্তর তাকে বলা হয় ইনফ্রা-রেড্ বা অবলোহিত। ১৮০১ সালে রিটার আলট্রা-ভায়োলেট আলোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। কবি এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই এর সাহায্য নিয়েছেন নিজের বক্তব্য প্রকাশের জন্য।

'ওকে অসত্য বলে না। যে রশ্মি বেগনির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না ব'লেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগনি পেরোনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাগ্-ঐতিহাসিক বলব না, সে আলট্রা-ঐতিহাসিক।' (সে, প্রথম সং, পৃঃ ১৩৭)

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারে কবি চমৎকৃত। পুপুর মুখে তাই শোনা যায়, '(বিজ্ঞান) মরা মানুষের গান শোনাচ্ছে, দূরের মানুষের চেহারা দেখাচ্ছে, আবার শুনছি শিষেকে (সীসে?) সোনা করছে, তেমনি একদিন হয়তো

এমন একটা বিদ্যুতের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে একজন আর একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।'

আলোকের তত্ত্বসমূহও কবির অজানা নয়। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব প্রচলিত।

একটি কণিকা তত্ত্ব বা Corpuscular and Emission Theory, অপরটি তরঙ্গ তত্ত্ব বা Wave or Undulatory Theory। প্রথমটিতে বলা হয়েছে আলোক কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে তৈরী তাদের বলা হয় Corpuscle। এরা কোন জ্বলন্ত বস্তু থেকে বিনির্গত হয় এবং চোখের রেটিনার উপর এসে ধাক্কা দেয় বলে আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি আসে।

দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে এসব নয়, সমগ্র বিশ্ব (যাবতীয় বস্তু এবং মহাশূন্য সমেত) জুড়ে রয়েছে 'লুমিনিফেরাস ইথার'। আলোক ইথরের মধ্যে তরঙ্গ প্রবাহের মতো। যেমন জলের তরঙ্গ, শব্দের তরঙ্গ, তেমনি আলোকও তরঙ্গ বিশেষ।

দুটি তত্ত্বই বিরাজিত। কাউকে নস্যাৎ করা চলছে না। 'সে' গ্রন্থের চতুর্দশতম গল্পে ঃ 'সত্যযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রমথবাবুর (প্রমথনাথ সেনগুপ্ত ?) কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণা বর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গ ধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি হয় এটা নয় ওটা, কিন্তু বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে একই কালে দুটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপুও বটে বেড়ালও বটে, এটা সত্যযুগের কথা।' শেষের লাইনটি অস্পষ্ট। প্রাণীদেহের পরমাণু সমশ্রেণীর হয়তো একথাটাই কবি বোঝাতে চেয়েছেন।

পৃথিবীর আদিম যুগে যে সব অতিকায় প্রাণীর দল পৃথিবীর ভূমি রাখতো বিকম্পিত ক'রে তাদের কথা গল্পচ্ছলে কবি বলেছেন, 'তোমার বিশ্বাস ছিল আমি ম্যাসটোডন কিম্বা মেগাথেরিয়ম হোতে চাইব কেন না জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন আগেই আলোচনা করেছি। তখন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকা রকম করে জমাট হয়ে ওঠেনি তার মহাদেশ। গাছপালা-গুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম তুলির টানের। সেই দিনকার আদিম অরণ্যে সেই দিনকার অনিশ্চিত শীতগ্রীষ্মের অধিকারে এই সব ভীমকায় জন্তুগুলোর

জীবযাত্রা চলছে কী রকম করে, তা স্পষ্টরূপে কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মানুষ এই কথাটা তোমার শোনা ছিল আমার মুখে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্য যুগটাকে স্পষ্ট ক'রে জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলে। তাই আমি যদি হঠাৎ বলে উঠতুম, সে কালের রোঁয়াওয়ালা চার দাঁতওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে, তাহোলে তুমি খুসি হোতে। তোমার কাবুলিবেড়াল হওয়ার থেকে এই ইচ্ছে বেশি দূরে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মুখে ঐ ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হোত। কিন্তু সুকুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল অন্যদিকে। (সে)

সুকুমারের মন বিজ্ঞানীর। সে 'এরোপ্লেনের মাঝিগিরি' শিখতে গেছে। তার মনের সঙ্গে কবি যেন একাত্মতা অনুভব করেছেন। কবির কল্পনা সুকুমারের ডায়েরী মারফৎ প্রকাশিত। 'মনে আছে একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চ'ড়ে পুপুদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের একধার থেকে আর এক ধারে। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। য়ুরোপে চন্দ্রলোকে খাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই।'

মহাকাশযাত্রার এই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত।

'গল্পসল্প' গ্রন্থেও প্রকাশ পেয়েছে বিজ্ঞানই আজ তাঁর প্রিয়। বইয়ের প্রথম গল্প 'বিজ্ঞানী'। বিজ্ঞানীদের অন্যমনস্ক স্বভাব, ভুলো মন তাঁর বরং ভালই লাগত। গল্পের কুসমি তার দাদামশায়কে জিজ্ঞেস করছে বিজ্ঞানী নীলমণিবাবুর সম্বন্ধে—মানুষ এতবড়ো বোকা হয় কী ক'রে। দাদামশায় জবাব দিলেন 'অমন কথা বোলো না দিদি, অঙ্কশাস্ত্রে ও পণ্ডিত। অঙ্ক কষে কষে ওর বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হয়েছে যে, সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না।'

বিজ্ঞানী নীলমণি চটি হারায় কেন তার জবাব খুঁজে পান না, অথচ চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেণ্ড দেরী হয় কেন তা তাঁর অঙ্কে ধরা পড়বেই।

বিজ্ঞানীদের কবি ভালবাসেন আপন ঘরের মানুষের মতো। গল্পের শেষ প্যারাগ্রাফটি তার প্রমাণ, 'দেখো দিদি, সবশেষে তোমাকে একটা

কথা বলে রাখি। তুমি ভাবছ নীলু লক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তোমার বউদি রেগেই আছেন। গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি—একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মুগ্ধ। আমারও সেই দশা।'

১৯৩৮ সালে লেখা 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে কবি তাঁর ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে যে ভাবে বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন তা দেখলে অবাক হতে হয়। ভাষার মমতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বললেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, এমন সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা, তাদের প্রকাশ নেই, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তারা অখ্যাত। জীবজগতে মানুষ জোতিষ্ক জাতীয়, মানুষ দীপ্ত নক্ষত্রের মতো কেবলই আপন শক্তি প্রকাশ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে। জ্যোতিষ্কনক্ষত্রের মধ্যে পরিচয়ে বৈচিত্র্য আছে, কারও দীপ্তি বেশি, কারও দীপ্তি ম্লান, কারও দীপ্তি বাধাগ্রস্ত। মানবলোকেও তাই। কোথাও ভাষার উজ্জ্বলতা আছে, কোথাও নেই।' ভাষা বিজ্ঞানীরা কাঠামো বিচার করে ভাষার জাত নির্ণয় করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রায় সমস্ত শব্দেরই একটা মূলধাতু আন্দাজ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'প্রাণ জগতে প্রাণী সৃষ্টির আরম্ভে দেখা দেয় একটি একটি করে জীবকোষ, তার পরে তাদের সমবায়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব। এক একটি জীব এক একটি বিশেষ কাঠামো নিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস অনুসরণ করে। জীববিজ্ঞানীরা তাদের সেই কাঠামোর ঐক্য থেকে নানা পরিবর্তনের ভিতরেও তাদের শ্রেণী নির্ণয় করেন।'

বিজ্ঞানের ছাত্ররা 'পদার্থ' বলে একটি শব্দের সঙ্গে খুবই পরিচিত। সত্যি কথা বলতে পদার্থ বলে কোন জিনিস নেই। জল, মাটি, পাথর, লোহা নানা বস্তু আছে। এমন ধরনের অনির্দ্দিষ্ট ভাবনাকে মানুষ তার ভাষায় বেঁধে দেয়। কিন্তু কেন? দরকার আছে বলেই বাঁধে। কবি বলেছেন, 'বিজ্ঞানের গোড়াতেই এ কথাটি বলা চাই যে, পদার্থ মাত্রই কিছু না কিছু জায়গা জোড়ে। ঐ একটা শব্দ দিয়ে কোটি কোটি শব্দ বাঁচানো গেল। অভ্যাস হয়ে গেছে বলে এ সৃষ্টির মূল্য ভুলে আছি। কিন্তু ভাষার মধ্যে এই সব অভাবনীয়কে ধরা মানুষের একটা মস্ত কীর্তি। বোঝা হাল্কা করা এইসব সরকারি শব্দ দিয়ে বিজ্ঞান দর্শন ভরা।'

বিজ্ঞানের ভাষা কেমন হওয়া উচিত তাও কবি বলেছেন এই গ্রন্থে—

'মানুষের বুদ্ধি সাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে, বিজ্ঞানে। জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই ; তাতে ঠিক কথাটার মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়।' সাহিত্যের ভাষা এবং বিজ্ঞানের ভাষা এক নয়। পার্থক্য দেখিয়ে কবি বলেছেন, 'হৃদয় বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। ভাবের ভাষা যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে বলা না হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্ত মতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ, ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা ক'রে দিয়ে।'

'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি এখানে উদ্ধৃতি করবার লোভ সামলাতে পারছি না। উদ্ধৃতি দেবার আগে কোন টীকা নিষ্প্রয়োজন ও বাহুল্য মাত্র। 'আমাদের দেহের মধ্যে নানা প্রকার শরীরযন্ত্রে মিলে বিচিত্র কর্ম প্রণালীর যোগে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকার ঘটলে তবেই তার দুঃখবোধে দেহব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করে চেতনা জেগে ওঠে।

আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিনরাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জে বিশেষ্যে বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধি প্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল এবং জটিল।...আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতি নিয়ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি সৃষ্টি করছে কত ছবি, কত রস—তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রকমের তার জাদুশক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহ তারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষারঙ্গের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু বাণীলোকের রহস্যে বিস্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে অনেক গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহু লক্ষ তারা-চলার পথ পেরিয়ে আজ আমাদের চোখে এসে পৌঁছল ; কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকাচক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করতে পেরেছে।'

রবীন্দ্রনাথ যে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক মেজাজের লেখক তা সুন্দরভাবে প্রকটিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে বলেছেন 'বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয়নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হয়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হ'তে পারে।'

বিজ্ঞান যে কবির অতি প্রিয় তার স্বাক্ষর 'তিনসঙ্গী'র (১৯৪০) তিনটি গল্প। গল্প তিনটির প্রধান পাত্রগণ সকলেই বিজ্ঞানী, ঘটনাপ্রবাহও বিজ্ঞান চর্চার খাতে প্রবাহিত হয়েছে, এমন কি পাত্রপাত্রীগণের আলাপ আলোচনাও বৈজ্ঞানিক সূত্রকে অবলম্বন ক'রে। 'ল্যাবরেটরী' গল্পের নন্দকিশোর, অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী ও রেবতী ভট্টাচার্য তিনজনেই বৈজ্ঞানিক। 'শেষ কথা'র অধ্যাপক অনিল সরকার ও নবীনমাধব (প্রথমে যন্ত্রবিজ্ঞানী, পরে খনিজ বিদ্যাবিশারদ) বিজ্ঞানী। 'রবিবার' গল্পের অমর ও অভীকও তাই। অমর বিজ্ঞানী, অভীক বিজ্ঞানী হতে চলেছে। অবশ্য অভীককে বিজ্ঞানীর চেয়ে মেকানিক্ বললেই ভালো হয়। বীক্ষণাগার ও মানবজীবন তথা মনকে কবি দেখেছেন একই ভাবে, রেখেছেন একই স্তরে, সমবিন্দুতে।

'রবিবার' গল্পে নায়িকা বিভার মামা আদিত্যবাবু 'গণিতে ফার্স্ট ক্লাস মেডালিষ্ট'। অমরবাবু প্রসঙ্গে 'ওঁর কষা একটুখানি প্রব্লেম আইনষ্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যা উত্তর পেয়েছিলেন সেটা আমি দেখেছি।'

এই অমরবাবুকে বিদেশে পাঠানোর জন্যে বিভা তার দামী গয়না বেচতে প্রস্তুত। অমরবাবুর কথা : আমার রক্তে এ পর্যন্ত ছুটির মাইক্রোব ঢোকবার সময় পায়নি। কিন্তু আমিও আজ ছুটি নেব। কারণটা বুঝিয়ে বলি। এ বছর কোপেনহেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিক্স কনফারেন্স হবে। আমার নাম কী করে ওদের নজরে পড়ল জানিনে। 'শেষকথা'র প্রধান পাত্র ডাক্তার নবীনমাধব সেনগুপ্ত প্রথমে দীক্ষা নিলেন যন্ত্রবিদ্যায়। পরে দেখলেন, 'যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আরো গোড়ায় যাওয়া চাই, যন্ত্রের মাল মসলা-সংগ্রহ শিখতে হবে। ধরণী শক্তিমানদের জন্যে জমা করে রেখেছেন তাঁর দুর্গম জঠরে কঠিন খনিজ পদার্থ। এই নিয়ে দিগ্বিজয় করেছে তারা, আর

গরিবদের জন্যে রয়েছে তার উপরের স্তরে ফসল—হাড় বেরিয়েছে তাদের পাঁজরায়, চুপসে গেছে তাদের পেট। আমি লেগে গেলুম খনিজবিদ্যা শিখতে।'

কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

(১) যৌবনের গোড়ার দিকে নারী প্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজমে জীবনের মেরুপ্রদেশের আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তখন আমি ছিলুম অন্যমনস্ক...

(২) জিয়লজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল, খুঁজছিলুম রেডিয়মের কণা, যদি কৃপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে বের করা যায়...

এই গল্পের পাত্রী অচিরা 'কোয়ান্টম থিয়োরী' শোনে, বুঝতে চেষ্টা করে আইনষ্টাইনের Time space বা দেশ-কাল তত্ত্ব।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার জন্যেই অচিরা নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল নবীনমাধবের কাছ থেকে। খাঁটি বিজ্ঞানী নিরাসক্ত, তার মন সন্ন্যাসীর। একারণেই অচিরাকে না পাবার দুঃখ নবীনমাধবকে তেমন বাজলো না। বরং 'মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল—বুঝলুম একেই বলে মুক্তি'। এবং বিজ্ঞানী বাড়ী ফিরে গিয়ে কাজের নোট, রেকর্ডগুলো খুলে বসলেন। বিজ্ঞানের সাধনা আবার শুরু হলো।

'ল্যাবরেটরি' গল্পের নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাশ করা এঞ্জিনীয়র।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার দৈন্য কবিকে দুঃখ দিত। উপযুক্ত জিনিসের অভাবে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা বসে থাকেন হাতগুটিয়ে। প্রতিভার অপমৃত্যু এর থেকে আর কি হ'তে পারে? কবি 'ল্যাবরেটরি' গল্পে তাই বলেছেন: 'লোকটা (নন্দকিশোর) ছিল সৃষ্টিছাড়া। ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওঁর সমস্ত মনপ্রাণ চৌকির দুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত ঝেঁকে ঝেঁকে। জর্মনি থেকে আমেরিকা থেকে এমন সব দামী দামী যন্ত্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়াদেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সস্তা দরের পাত পাড়া হয়।

ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সট বুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাঁটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, মমতা আছে আমাদের মগজে অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া ক'রে এই হোলো ওঁর পণ।'

বিজ্ঞানীর স্বামী-স্ত্রীতে হওয়া চাই ব্রতের মিলন। তাই কবি বলেন 'স্বামী হবে এঞ্জিনীয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনী, এটা মানব ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।'

নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরিতে আছে 'হুটো গ্যালভানোমিটর একেবারে হাল কায়দার'। আছে 'হাই ভ্যাকুয়ম পম্প', আর 'মাইক্রোফোটোমিটর' 'ক্রনোমিটার' ইত্যাদি নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি, সোহিনী খোঁজ রাখেন 'রেবতী ম্যাগনেটিজম নিয়ে কাজ করছেন'। তাই 'সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চলুক, যত দাম লাগে লাগুক না'।

ছুটি উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা যাক্।

(১) পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল 'নন্‌কম্‌বাষ্টিবল।'

(২) আমার প্রবেশ নিষেধ পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন যায় ন'ড়ে।

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী 'ল্যাবরেটরি' গল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'তিনি (রবীন্দ্রনাথ) এই গল্পের নরনারীকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছেন। আচারহীন পাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর বিজ্ঞানের পাত্রে তরল চরিত্র ঢেলে নীচে দিয়েছেন বুনসেন বার্ণার। ফুটন্ত চরিত্রগুলোকে একসঙ্গে মেশানো হল। রাসায়নিক বস্তুগুলি পরস্পর পরস্পরকে কেবল আঘাত করতে লাগল, মিলতে পারল না।'

এখন একটা প্রশ্ন জাগতে পারে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে সাহিত্যের উপাদান রূপে গ্রহণ করেছেন তার প্রকৃত তাৎপর্য কি? বাঙালী সমাজের ক্ষুদ্রায়ত জীবনের বহু অংশকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন, হয়ত নতুন উপাদানের সন্ধানে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে গ্রহণ করেছেন, হয়ত তা নয়। বিজ্ঞানের প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ এর কারণ হতে পারে। মনে হয় সেইটেই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিখ্যাত

সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মতামত উদ্ধৃতির যোগ্য। তিনি 'তিনসঙ্গী' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "বিজ্ঞানের প্রতি বরাবর তাঁহার (কবির) একটা কৌতূহল ছিল, এই কৌতূহলের টানেই তিনি জগদীশচন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষজীবনে এই কৌতূহল বৃদ্ধি পায়, যাহার সাহিত্যিক ফল 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ, প্রকাশ কাল ১৯৩৭ সাল। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি তরুণ ও প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেটাও বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণের একটা রকমফের। এইসব বিষয় স্মরণীয়।"[৫৫]

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী ছিলেন না কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি মানুষের মনকে আবদ্ধ স্থান থেকে মুক্তি দেবে। আপাতসত্য, অৰ্দ্ধসত্য ও মিথ্যার কুহেলী অপসারিত করে ঋজু-শুভ্র সত্যকে প্রকাশ করে বিজ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা, কৌতূহল এবং বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ তাঁকে বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী করেছিল। বিজ্ঞানীদের কাছে এই 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' খুব বড়ো কথা। বিজ্ঞানের রাজ্যে আজ যে তত্ত্বকে সত্য বলে মনে হচ্ছে আগামী কাল হয়তো তার মূল্যায়ন অন্যরূপ হবে। কাজেই একটি তত্ত্বকেই আজীবন সত্য বলে মেনে নিলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে নেমে আসবে বাধা। যেহেতু বিজ্ঞানের মূল কথা অপরিসীম ধৈর্য ও অনন্ত জিজ্ঞাসা। কৌতূহল যেখানে নীরব, চিন্তা যেখানে প্রথাবদ্ধ, সেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতিও স্তব্ধ। এ বিষয়ে J.D. Bernal তাঁর 'Science in History' গ্রন্থে সুন্দর কথা লিখেছেন।

The greatest difficulty of discovery is not so much to make the necessary observations, but to break away from traditional ideas in interpreting them.

From the time when Copernicus established the movement of the earth and Harvey the circulation of blood, down to that when Einstein abolished the ether, and Planck postulated the quantum of action, the real struggle has

---

৫৫ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প—প্রমথনাথ বিশী

been less to penetrate the secrets of Nature than to overthrow established ideas, even though these, in their time, had helped to advance science.

যে তত্ত্ব প্রসারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, যে ধারণা বিজ্ঞানের ভাবনার জগতে স্থিতিশীলতা এনেছে তা নিঃসন্দেহে অশুভ। শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয় সামাজিক ক্ষেত্রেও চিন্তার স্থিতিশীলতা দুর্বিপাক আনে। একই মতবাদ ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে বাসা বেঁধে ক্রমান্বয়ে অচল, অনড় হয়ে পড়ে। জীবনের কোন স্পন্দন থাকে না তার মধ্যে। তখনই সে তার অশুভ ছায়া ফেলে যে কোন স্পন্দনশীল ভাবনার পরে। রুদ্ধ করে তার গতি। অতীতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় কেন সৌর-কেন্দ্রিক মতবাদ প্রচারের জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হলো আর গ্যালিলিওকে কারাগারে স্থান নিতে হলো। বছরের পর বছর ধরে চার্চে, মন্দিরে যে ধারণা চলে আসছিল তা স্থাণুবৎ হয়ে অগ্রগতি রোধ করলো সঞ্জীবনী চিন্তাধারার। ক্ষমতার দণ্ড নিয়ে এলো সত্যের কণ্ঠরোধ করতে।

বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ সর্বরকম মানসিক দাসত্ববোধ থেকে বিমুক্ত ছিলেন। তাঁর যৌবনেও সমাজ সেই মধ্যযুগের ধ্যানধারণার পঙ্কে আচ্ছন্ন। সেই কালে বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাঁর সহজাত দিব্যদৃষ্টি দিয়ে যে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তারই ফলশ্রুতিরূপে বিজ্ঞানের জন্য আজীবন তাঁর হৃদয়কে প্রসারিত করে রেখেছিলেন। বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে তাঁর মানবচেতনার সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে[৫৬] রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একাধারে অপার্থিব রসানুভূতি ও বস্তু-তন্ত্র বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়; সেই জন্যই তাঁহার রচনা ও আলোচনা উভয়ই কল্পনা ও বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল।'

বৈজ্ঞানিকের কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, প্রতিটি বস্তুর প্রতি তাঁর কৌতূহল চিরজাগ্রত। তেমনি, 'রবীন্দ্রনাথের মনও এই বিশ্বন্ধর বৈজ্ঞানিক মন।... বৈজ্ঞানিক বিশ্বন্ধরত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে রসানুভূতিজাত কল্পনা ও প্রকাশ-শক্তির একত্র সমাবেশ, পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গিয়াছে।...আমাদের দেশে রস-

৫৬ বাকপতি রবীন্দ্রনাথ: 'রবীন্দ্রনাথ' (পৃঃ ১-২): দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

রচয়িতাদের মধ্যে এরূপ সর্বন্ধর বৈজ্ঞানিক মন বোধহয় এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই দেখা দিয়াছে।

বিশ্ব প্রপঞ্চের ব্যাপার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঔৎসুক্য এবং অনুধারণের পরিচয় দিয়াছেন। গণিত, ফলিত বিজ্ঞান—দ্যুলোকতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য ও সংস্কৃতিপূত চিত্তের উপযোগী কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা তাঁহার আছে। তাঁহার মধ্যে রসসৃষ্টির অপরিহার্যতা বা অবশ্যম্ভাবিতা না থাকিলে, এই মন লইয়া রবীন্দ্রনাথ হয়তো এমন একজন বড় দরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হইতে পারিতেন।'[৫৭]

রবীন্দ্রনাথ আর্টের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ সন্ধান করতে যান্ত্রিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, কারণ তা সম্ভব নয়। সাহিত্য এবং বিজ্ঞান উভয়েই নিত্যপ্রবহমান, নিত্য পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের গতি ক্রমশই দ্রুততর হচ্ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে দ্রুততা। কাজেই সংযোগ-সূত্র গভীর না হলেই যে মিল থাকবে না একথা মেনে নেওয়া যায় না।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের পুরোনো সমাজের ভিত্ দিয়েছে পালটে। তাতে তার চেহারার পরিবর্তন হয়েছে আমূল। বিজ্ঞান সমাজকে পাল্টেই ক্ষান্ত হয় নি, তার প্রভাব বিস্তৃততর হয়েছে দর্শন ও শিল্পের এলাকায়। বিজ্ঞানের বহু তথ্য ও তত্ত্ব রূপান্তরিত হয়ে প্রবেশ করেছে দর্শন ও সাহিত্যে। এই প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। এবং এর প্রয়োজনও আছে। এই পালাবদলের ফলে মানুষের চিন্তা ভাবনার ধারা নিয়েছে নতুন রূপ। বলিষ্ঠতা এসেছে, এসেছে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তি মানুষের চিন্তার জগতে। এমন কি বিজ্ঞানের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটেছে।

বিজ্ঞান বললেই বোঝাতো 'তত্ত্ব বা তথ্যের জ্ঞান' অথবা 'সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সর্বজনগ্রাহ্য যাবতীয় জ্ঞান।' কিন্তু বর্তমান কালে ঐ সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিয়েছে স্বতন্ত্র ভাবে। এখন বিজ্ঞান মানে হচ্ছে 'প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং তাদের সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ বিশেষ জ্ঞান।'

আজ একথা বলবার দিন এসেছে যে বিজ্ঞান আর্টের শত্রুশিবির নয়,

---

৫৭ বাকপতি রবীন্দ্রনাথ : 'রবীন্দ্রনাথ' (পৃঃ ১-২) : দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বরং তার মিত্রপক্ষীয়। কবিরা অভিযোগ করেন একদিন যে সব ভাবনাকে আশ্রয় করে মানুষের কল্পনা ডানা মেলে উড়ে যেত আজ বিজ্ঞানের গবেষণাগারে তার রহস্যভেদ হয়েছে। কল্পনার অবাস্তব জগতে রস-রূপ নিয়ে যারা বিবর্ধিত হতো কবি-মানসাকাশে, আজ পৃথিবীর রুক্ষমাটির বুকে সে নেমে এসেছে। যে চাঁদ নিয়ে কবিদের কল্পনার অন্ত ছিল না, আজ তার কল্পনাশ্রয়ী সৌন্দর্য টুটে গেছে। এসবই সত্যি। কিন্তু এ-ও কি সত্যি নয় যে আমাদের জানার পরিধি যত বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে অজানার গণ্ডীও বিস্তৃততর হচ্ছে। কাজেই যেখানেই অজানা রহস্য, সেখানেই কবি-কল্পনা রঙীন ফানুস হয়ে উড়ে যাবে। প্রসারিত হবে কল্পচেতনা, বিস্তৃত হবে তার এলাকা, জেগে উঠবে নতুন ছন্দ, নতুন রঙের প্রলেপে আঁকা ছবি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন কবি-সাহিত্যিকের ক্যানভাসে ফুটে উঠবে নতুন কল্প-চিত্র। পর্যবেক্ষণার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হবে চিত্র-পট। বিজ্ঞানাশ্রয়ী বাস্তব এবং কল্পনা কাছাকাছি থেকে সৃষ্টি করবে নব নব সৌন্দর্যের। রবীন্দ্রনাথ তারই পথপ্রদর্শক।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী *

বিষয়	প্রকাশের বৎসর	মাস	পত্রিকার নাম
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র	১৭৯৫ শক	জ্যৈষ্ঠ	তত্ত্ববোধিনী
ঐ	ঐ	আষাঢ়	ঐ
ঐ	ঐ	আশ্বিন	ঐ
ঐ	ঐ	কার্তিক	ঐ
ঐ	ঐ	পৌষ	ঐ
ঐ	ঐ	মাঘ	ঐ
সামুদ্রিক জীব (প্রথম প্রস্তাব) 'কীটাণু'	১২৮৫ বঙ্গাব্দ	বৈশাখ	ভারতী
শূন্য	১২৮৮	ভাদ্র	ভারতী
জগৎ-পীড়া	১২৮৮	চৈত্র	ঐ
বৈজ্ঞানিক সংবাদ	১২৯২	অগ্রহায়ণ	বালক
ডেঞ্চে পিঁপড়ের মন্তব্য (ব্যঙ্গ কৌতুক)	ঐ	চৈত্র	ঐ
গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়	১২৯৮	অগ্রহায়ণ	সাধনা
ইচ্ছামৃত্যু	ঐ	ঐ	ঐ
মাকড়শা সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব	ঐ	ঐ	ঐ
উটপক্ষীর লাথি	ঐ	ঐ	ঐ
রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য	ঐ	পৌষ	ঐ
জীবনের শক্তি	১২৯৮	পৌষ	সাধনা
মানব শরীর	ঐ	ঐ	ঐ
প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব (বৈজ্ঞানিক ব্যঙ্গ রচনা)	ঐ	ঐ	সাহিত্য

বিষয়	প্রকাশের বৎসর	মাস	পত্রিকার নাম
উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য	১৩০০	জ্যৈষ্ঠ	সাধনা
অভ্যাসজনিত পরিবর্তন	ঐ	আষাঢ়	ঐ
মানুষ সৃষ্টি	ঐ	ভাদ্র	ঐ
ওলাউঠার বিস্তার	ঐ	ঐ	ঐ
ঈথর	ঐ	ঐ	ঐ
ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ু প্রবাহ	১৩০১	আশ্বিন/কার্তিক	ঐ
বৈজ্ঞানিক কৌতূহল	১৩০২	ভাদ্র	ঐ
আচার্য জগদীশের জয়বার্তা	১৩০৮	আষাঢ়	বঙ্গদর্শন
জড় কি সজীব ?	১৩০৮	শ্রাবণ	ঐ
বিজ্ঞান সভা	১৩১২	জ্যৈষ্ঠ	ভাণ্ডার
খাদ্য চাই	১৩২৬	আষাঢ়	শান্তিনিকেতন
আহারের অভ্যাস	১৩২৬	আশ্বিন ও কার্তিক	ঐ
বিশ্বপরিচয় (গ্রন্থ)	১৩৪৪	আশ্বিন	
অরণ্যদেবতা	১৩৪৫	ভাদ্র	পল্লীপ্রকৃতি (গ্রন্থ)

* এই প্রবন্ধের তালিকা সম্পূর্ণ এমন কথা বলা যায় না। তবে যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান ক'রে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কোন পাঠকের বা গবেষকের রবীন্দ্রনাথ রচিত আরো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের নাম জানা থাকলে অনুগ্রহ করে লেখককে জানালে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

নাম-সূচী

প্রবন্ধ

মৌলিক

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১২·০০
নৈরাজ্যবাদ—ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু	...	১০·০০
বাংলা কাব্য প্রবাহ—চিত্তরঞ্জন মাইতি	...	১০·০০
ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬·০৭
বাঙালী—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	...	৬·০০
সাহিত্যের কথা—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬·০০
মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	...	৬·০০
চায়ের ধোঁয়া—উৎপল দত্ত	...	৬·০০
আমার ঘরের আশে পাশে—ডঃ তারকমোহন দাস [নরসিং দাস পুরস্কার প্রাপ্ত] ভূমিকা ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক	...	৫·০০
বিবাহ সাধনা—শচীন্দ্র মজুমদার	...	৩·০০

অনুবাদ

জীবন জিজ্ঞাসা—আইনস্টাইন সংকলন ও অনু ঃ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক	...	৮·০০
ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ সংকলন ও অনু ঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৫·০০
সুখের-সন্ধানে—বারট্রাণ্ড রাসেল অনু ঃ পরিমল গোস্বামী	...	৫·০০